অখণ্ড প্রাচীন বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু

মফিদা আকবর

আমি বাঙালি। আমার মুখের ভাষা বাংলা। আমার জন্মভূমিও বাংলা। অর্থাৎ আমার দেশ– বাংলাদেশ। অথচ সেই বাংলাদেশটিই কি করে 'বাংলাদেশ' হিসেবে রূপান্তর হয়েছিল– কার নেতৃত্ব, আন্দোলন-সংগ্রামে এবং রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রের সাথে আরো একটি মানচিত্র যোগ হলো এরই ধারাবাহিক নিরীক্ষণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

ব্রিটিশ ভারত থেকে অপসারিত হয় ১৯৪৭ সালে। আর ১৯৪৭ সালেই ভারত ভাগ হয়ে দুটি দেশের জন্ম হয়। একটি ভারত অপরটি পাকিস্তান। পাকিস্তানের একটি সমৃদ্ধ অংশ পূর্ব বাংলা। পূর্ব বাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে আজকের 'বাংলাদেশ'।

সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। প্রাচীন আমল থেকেই এই সমৃদ্ধ জনপদের প্রতি ছিল বিদেশিদের তীব্র আকর্ষণ। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র এই দুই বিশাল নদীর অববাহিকায় গঠিত বাংলাদেশ বিশ্বের এক অতি সমৃদ্ধ দেশ। তাই যুগে যুগে এবং সময়ে সময়ে বিদেশিরা তীব্র আকর্ষণে এদেশে প্রবেশ করেছে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, প্রাচীন যুগে আর্যরা, মধ্যযুগে তুর্কী ও মুঘলরা, এরপর গোরারা বাস করেছে এবং শাসন করেছে এ দেশ। মুঘলদের পতনের পর ব্রিটিশরা ভারত দখল করে। মূলত বাণিজ্যের নামে ভারতে প্রবেশ করে ব্রিটিশরা।

নেপথ্যে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজশক্তির পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ আনুকূল্য সবসময় সক্রিয় ছিলো। কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যবাদের আনুষ্ঠানিক শাসনদণ্ড অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে পরবর্তী সময়ে এই অবিচ্ছিন্ন বণিক শক্তির শেকড় প্রোথিত হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশের আধিপত্যের কারণে ভারতবর্ষের জনগণ ক্রমাগত নির্যাতিত, নিগৃহীত হয়ে চলেছিলো নিজভূমে। এই সামন্তীয় রাজনৈতিক ধারা প্রবাহের ব্যাপ্তি হচ্ছে ১৭৫৭ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত– অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের আগ পর্যন্ত। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষদিকে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ভারত বিভক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান নামক ধর্মভিত্তিক একটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক ধারায় বাংলাদেশের ইতিহাস বলতে গেলে উনিশ শতকের শেষদিকে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সর্বত্র পরিপক্কতার অভাব ছিলো তখন। ঐতিহাসিক কারণেই ভারতের জনগণ তখনো পর্যন্ত আধুনিক রাজনীতি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাজনীতির শান্তিপূর্ণ নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অনেকটাই অজ্ঞ ছিলো।

১৮৮৫ সালে ভূমিষ্ঠ হওয়া কংগ্রেস শুরুর পর্যায়ে একটি অসাম্প্রদায়িক সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও কিছুদিনের মধ্যেই এই সার্বজনীন রাজনৈতিক সংগঠনটি তার সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক চরিত্রটি ভুলে যায়। এ সময় কংগ্রেসের চেহারায় দু'টি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তিত অবস্থার একটি ইতিবাচক হলেও অপরটি ছিলো নেতিবাচক এবং আত্মঘাতীমূলক। সর্বভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেস তার সর্বভারতীয় জাতীয় চরিত্রটি হারিয়ে সংগঠনের কর্মসূচিতে সমাজের ব্যাপক সাধারণ জনগণের চাহিদার বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে না। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কংগ্রেসের রাজনীতিতে ভারতের কৃষক, শ্রমিক, নিম্ন আয়ের গণমানুষ এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন বিষয় তেমন করে স্থান পায়নি। বরং খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে কংগ্রেস ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত এবং বুর্জোয়া সামন্তদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। সংগঠনের নেতৃত্বে ক্রমেই সম্প্রদায় বিশেষ হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে ভারতের অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্যে অপর একটি আলাদা সংগঠন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরকম একটি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ভারতের মুসলমানগণ উপলব্ধি করেন বিপরীতমুখী একটি সংগঠনের। এরই প্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে সম্প্রদায়ভিত্তিক দল মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

বিশাল দেশ ভারত। বিপুল জনগোষ্ঠীর অধ্যুষিত দেশে ইংরেজদের বিভক্তিকরণের মাধ্যমে শাসন নীতিকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে মুসলিম লীগ নেতা ভারতীয় রাজনীতিতে তার অবাঙালি পূর্বসূরীদের চিন্তার ফসল 'দ্বিজাতি' নামক এক অসাড় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়ে গেলেন। ভারতীয় রাজনীতির প্রতি অকস্মাৎ বিতশ্রদ্ধ জিন্নাহ ধর্মের ছুরি দিয়ে অবাধে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে। পাশ্চাত্যবাদী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জিন্নাহ তার ব্যক্তি জীবনে ধর্মভীরু না হয়েও মুসলিম লীগের রাজনীতিতে ধর্মকেই অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগালেন। জাতীয় কংগ্রেসও জিন্নাহর ভারত বিভক্তির দাবির কাছে নতজানু হয়ে পড়লো। গান্ধী-নেহরুর ভিতরেও তেমন একটি বিষয় বোধ সন্তর্পণে লালিত ছিল– হিন্দু অধ্যুষিত ব্যবচ্ছেদকৃত স্বাধীন ভারতের অস্তিত্ব হৃষ্ট চিত্তেই মেনে নিলেন তারা।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের কনভেনশনে লাহোরে সমবেত হলেন তৎকালীন ভারতের জনগোষ্ঠীর একাধিক নেতা। এই কনভেনশনেই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। যার মূল কথা ভারত বিভক্তি এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামের একটি মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। যার নাম হয় 'পাকিস্তান'। পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ভারত বিভক্তির মাধ্যমে আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তিত হওয়ার চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের ভাগ্য বিড়ম্বিত হওয়ার বিষয়টিই বারবার সামনে চলে আসছিল। ধর্মীয় কারণে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় 'পূর্ব বাংলা'। একসময় প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়ে পূর্ব বাংলা হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। এরকমই পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান ধর্মীয়ভাবে একই মতাবলম্বী হলেও শেষ পর্যন্ত ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির জন্য মানুষ আলাদা হতে বাধ্য হয়। কারণ খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এই সত্যটি উপলব্ধি করলো যে, এটা শুধু একচেটিয়া প্রভুত্বের হাত বদল হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের মূলত দ্বন্দ্বের শুরু প্রধানত ভাষার অধিকার এবং স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে। কেন্দ্র থেকে বারোশ' মাইল দূরবর্তী একটি প্রদেশ পূর্ব-বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত গোষ্ঠী তাদের শাসন-শোষণ নিরঙ্কুশ রাখার স্বার্থে বিশেষত দুটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়ার নীতি অবলম্বন করেন। এর মধ্যে একটি হলো ভারত ভীতি, অপরটি হলো ধর্ম। যে কারণে দেখা গেছে, যখনই ধর্মভীরু পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনচেতা জনগণ ন্যায্য দাবি কিংবা অধিকারের প্রশ্নে দাবি উত্থাপন করেছে অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের বিষয়গুলোকে অভিযোগ আকারে সামনে এনেছে তখনই পূর্ব বাংলার জনগণকে ভারতের চর বা কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। প্রকাশ্যেই দেশদ্রোহী হিসেবে দেশের জনগণকে চিহ্নিত করেছে আইয়ুব খানরা।

বস্তুতপক্ষে বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং ব্যাপক অন্যায় আধিপত্যের জন্যই মুসলিম লীগের কিছুসংখ্যক আত্মসচেতন, উদারপন্থী ও অসাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব আবার প্রয়োজন বোধ করেন আরও একটি আলাদা সংগঠনের।

এরই প্রেক্ষিতে ২৩ জুন, ১৯৪৯ সালে ঢাকার কে.এম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রাজনৈতিক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে একটি আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়। যার নাম দেয়া হয় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। এর সভাপতি নির্ধারিত করা হয়

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয় সর্বসম্মতিক্রমে শেখ মুজিবুর রহমানকে– যদিও তিনি সে সময় জেলে ছিলেন।

পরবর্তীকালে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে শেখ মুজিবকে সভাপতি করে দলমত, ধর্ম, নির্বিশেষে একই ব্যানারে বা পতাকাতলে সর্বসাধারণকে নিয়ে আসার জন্য প্রগতিশীল দল হিসেবে 'আওয়ামী লীগ' নামে পরিচিতি লাভ করে দলটি। আওয়ামী লীগের পতাকাতলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া এবং অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয় বাঙালিরা। দীর্ঘদিনের অবহেলা, অন্যায়, নির্যাতন, নিপীড়নে বাঙালিদের একসময় দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। উপায়ন্তর না পেয়ে বাঙালি-মাত্রই রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয় মুজিবের ডাকে।

কারণ পূর্ব বাংলার জনগণকে পশ্চিম-পাকিস্তানীরা শুরু থেকেই আশ্রিত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এরপর প্রথমেই বাঙালিরা ধাক্কা খায় (ক) ভাষা প্রশ্নে। কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় ভাষার সমর্থনে উর্দুকেই ইসলামী ভাষা হিসেবে দাবি করলেন এবং এর বিরুদ্ধে বাংলায় যখন বাংলা ভাষার প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের দাবি উঠলো তখন পাকিস্তানীরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে এটা প্রমাণ করতে চাইলো যে, বাংলা মূলত সংস্কৃতেরই একটি অংশ। বাংলাকে 'বিজাতীয়' ভাষা বলেও উপহাস করা হলো।

পশ্চিমাদের মতে, এই ভাষা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ভাষা। ফলে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে কিছুতেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় অন্তর্গত হয়ে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান তথা তাদের মতে, 'উর্দু' একমাত্র উর্দুই হবে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রীয় ভাষা।

(খ) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো একটি ক্যাডেট কোর্সে গড়পড়তা ১৫০ জন শিক্ষানবিস থাকলেও সেখানে বাঙালির সংখ্যা থাকতো নিতান্তই সাত থেকে আটজন। অকস্মাৎ খুব বেশি হলে বারো থেকে পনেরোজনের উপরে নয়। এই স্বল্পসংখ্যকের ওপর আবার ছাঁটাইয়ের খড়গ তো ছিলোই। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পশ্চিমাদের হিংস্রতা প্রকাশ পেতো বাঙালিদের উপর।

(গ) পূর্ব বাংলার সমস্ত আয়ের হিস্যা জমা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে।

(ঘ) পূর্ব বাংলার অর্থকড়ি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠতে থাকলো মিল-কারখানা। অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত সমৃদ্ধ হতে থাকলো পশ্চিমের প্রতিটি প্রদেশ।

(ঙ) চাকরি ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেতে থাকলো পশ্চিমারা। পূর্ব বাংলার জনগণ আশ্রিত এবং রিফিউজি হিসেবেই আখ্যায়িত হতে থাকলো সর্বত্র।

(চ) পূর্ব বাংলায় ব্রিটিশ আমলে যে উন্নয়ন হয়েছিল পশ্চিমা শাসনামলে এর ছিটেফোঁাও হয়নি।

(ছ) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নীতিতে ঐক্যের নামে যে, অস্পৃশ্য দর্শনের চর্চা করা হতো তার একটি দিক ছিলো যেমন : ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে ভারতের সাথে যুদ্ধের আগ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৪ শতাংশ মানুষের প্রতিরক্ষার জন্য নিয়োজিত করা হয় ১২টি পদাতিক ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডসহ আনুমানিক ২টি ট্যাংক ডিভিশন। এর বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ ছিলো ৩টি পদাতিক ব্রিগেডের সমন্বয়ে গঠিত ১টি মাত্র ডিভিশন। বিমান বাহিনীর ৯৫ শতাংশই ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো সামরিক উপস্থিতির নিদর্শনস্বরূপ মাত্র ১০টি স্যারের এফ ৮৬ জঙ্গি বিমান। নৌবাহিনীর সবটাই ছিলো পশ্চিমে। পূর্ব পাকিস্তানের জলসীমায় ছিলো গোটাতিনেক সেকেলে ধরনের গানবোট।

(জ) বর্ণ বৈষম্যও একটি বিষয় ছিল। পশ্চিমারা পূর্ব পাকিস্তানীদের কালো বর্ণের এবং দৈহিক কম উচ্চতার জন্যও খুব ঘৃণার চোখে দেখতো তারা।

(ঝ) খাবার-দাবার, পোশাক-আশাকসহ বাঙালিদের প্রত্যেকটি বিষয়েই পশ্চিমাদের এলার্জি ছিলো।

এরকম অসংখ্য বিষয় আছে যা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু অনেক সময় তা প্রকাশ করা যায় না। বিষয়গুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করলেই বোঝা যেতো।

বাঙালির এই তীব্র আত্মোপলব্ধি থেকেই একদিন শুরু হয়েছিল '৫২'র ভাষা আন্দোলন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন, ১৯৬২ সালের আন্দোলন, ১৯৬৫ সালের আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানের গণচৈতন্যের সংগ্রাম-আন্দোলনের ভেতর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে। ভাষা আন্দোলনের এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে পূর্ব-বাংলার জনগণরা ততদিনে অনেকখানি দুর্মর পথ হেঁটে এসেছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে। এই পরিস্থিতিতেই ১৯৬৯ সালের গণজাগরণের মধ্য দিয়ে প্রায় দুই দশকের আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বাঙালিরা আশাবাদী হয়ে উঠেছিলো। কারণ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক মানসিকতার ব্যাপক প্রয়োগ পূর্ব বাংলার মানুষের মনে প্রকারান্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করে। '৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, পরবর্তীকালে ৬ দফার ভিত্তিতে '৬৮, '৬৯'র গণজাগরণ এবং '৭০-র নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়– এসব

ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালির আপসহীন মনোভাবের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রকাশ পেয়েছে। আর এসবই হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দৃঢ় এবং আপসহীন নেতৃত্বে।

'৪৭ সাল থেকে '৭১– দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হীনমন্যতা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বাঙালিদের নিজেদের জাতিসত্তা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সর্বোপরি, মাতৃভাষা, নিজভূমে স্বাধীনভাবে বাঁচার, বসবাসের অধিকারের প্রতি দ্রুত মনোযোগী করে তুলেছিল ক্রমান্বয়ে।

আগেই উল্লেখ করেছি, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের দাবির প্রেক্ষিতে আইন সভায় পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু হয়। ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলন এবং ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের রাজনীতি উচ্চ শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

তাদের কর্মসূচির মধ্যে কৃষক-শ্রমিকের দাবি ছিল উপেক্ষিত। শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক নিপীড়িত কৃষকের পক্ষে কৃষক প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। তার আহ্বানে বাংলার কৃষকসমাজ দারুণভাবে সাড়া দেয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৪০ সালে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন। পরে মুসলিম লীগ তার প্রস্তাবকে পরিবর্তন করে পাকিস্তান দাবি করে। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে "ভারত ছাড়" আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি দেখলেন মুসলিম লীগের পাকিস্তান এবং কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের অধীনে বাংলার ভবিষ্যৎ রক্ষিত হবে না। তাই তিনি স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার দাবি করেন। ইংরেজ সরকার স্বাধীন বাংলার দাবি উপেক্ষা করে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। বাংলা বিভক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের অংশে এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ। স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে রাজা শশাঙ্ক, পাল রাজা, গৌড়ের সুলতান, ও বারো ভুঁইয়াগণ। এরপর স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। উপরোক্ত আপসহীন ত্যাগী নেতাগণের দেখা স্বপ্নকে লালন করে এবং বুকে ধারণ করে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনে বিশ্বের বুকে বাংলার মানচিত্রকে সমুন্নত করে চিহ্নিত করেন বিরল ভূমিকায় দাপটের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

মুনতাসীর মামুন

একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্ন, বাংলাদেশে বসবাসকারী অনেকে দেখেছে বহুদিন। অতীতে অনকে সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছেন যদিও তারা বাঙালি ছিলেন না। গত শতকের গত চল্লিশ বছরেও অনেকে সে ভূখণ্ডের কথা বলেছেন, ভারত ভাগ হওয়ার সময় সে পরিকল্পনাও একবার হয়েছিল। গত শতকের ষাটের দশকে মওলানা ভাসানীও বাঙালিদের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ডের কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে সেই স্বপ্নের রূপ কেউ দিতে পারেননি। সেই স্বপ্ন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাস্তবে রূপ পেয়েছিল একেবারে একজন খাঁটি বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। তিনিই পেরেছিলেন বাঙালিদের জন্য নির্মাণ করে দিতে একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সীমানা। বঙ্গবন্ধু বলি, জাতির জনক বলি বা শেখ মুজিব বলি- যে নামেই সম্বোধন করি না কেন, বাংলাদেশের কথা বললেই ভেসে ওঠে তাঁর অবয়ব এবং সে কারণেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ইতিহাসে এবং সে কারণেই আমরা তাঁকে স্মরণ করি বারবার।

১৯৭৫ সালের খলনায়করা যে ক্ষমতা দখলের একটা পাঁয়তারা করেছিলেন অনেকেদিন ধরে তারও কিছুটা তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন খোন্দকার মোশতাক। আমাদের ইতিহাসের অন্যতম এই খলনায়কের ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাবের পরিচয় পাই মুক্তিযুদ্ধের আগ থেকে। ২৫ মার্চ আওয়ামী লগিের প্রথম সারির নেতারা এসে ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুকে বলে গিয়েছিলেন সাবধানে থাকতে। সেদিন একমাত্র খোন্দকার মোশতাককে সেখানে দেখা যায়নি। স্বাধীনতার পর তিনি ওয়াজেদ মিয়ার কাছে তদবির করেছিলেন এ বলে যে, তাঁকে যেন জ্যেষ্ঠতাসহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়। আরো পরে, ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে একদিন ড. ওয়াজেদ মিয়া খোন্দকার মোশতাকের বাসায় গিয়ে দেখেন, রশীদ নামে এক মেজর তার সঙ্গে গোপন আলাপ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে জনাব হান্নান কর্তৃক প্রচারিত শেখ মুজিবের ঘোষণাটি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে। ড. ওয়াজেদ মিয়া

লিখেছেন- "বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি ছিল টেপকৃত। ঢাকার বলধা গার্ডেন থেকে ওই টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের পর ইপিআরের ওই বীর সদস্যটি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোনে যোগাযোগ হকরে পরবর্তী নির্দেশ জানতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু জনাব গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে ইপিআরের ওই সদস্যকে সম্প্রচার যন্ত্রটি বলধা গার্ডেনের পুকুরে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন।" তথ্যটি ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত সে নিয়ে বিতর্কে যাব না। ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে আমি বুঝি, ১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির পত্তন হয়েছিল এবং তা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে। সম্প্রতি অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর 'রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্তভাবে তা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে ৩৫টি নির্দেশ শেখ মুজিব জারি করেন তা কর্তৃত্ব প্রতিরোধ এবং অস্বীকার করার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতা এবং বিপরীত জনমুখী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বাঙালি জনসাধারণের সঙ্গে প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার ভিত্তি তৈরি করে।... বাঙালি জনসাধারণ একটি স্বতন্ত্র, বিকল্প, স্বাধীন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়ার জন্য বোধ করি যুদ্ধের পূর্ব থেকেই বুকের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে লালন করতে থাকে।"

ষাটের দশক থেকে বঙ্গবন্ধুর দুটি লক্ষ্য ছিল। একটি স্পষ্ট, আরেকটি অস্পষ্ট বা স্বপ্ন। স্পষ্ট লক্ষ্যটি ছিল আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা, দেশব্যাপী সংগঠন বিস্তৃত করা এবং আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা। আওয়ামী লীগে অন্তর্বিরোধ ছিল, দল ব্যাপক হলে যা হয় তাই হয়েছিল কিন্তু শেখ মুজিবের সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অনন্য। একটি দল বড় করতে হলে দুটি গুণের প্রয়োজন- সহিষ্ণুতা ও নমনীয়তা, তা তাঁর ছিল। আমি সুদূর গণ্ডগ্রামে এমন বৃদ্ধও দেখেছি, যার সম্বলমাত্র ছোট একটি চায়ের দোকান, কিছুই পাননি কখনো দল থেকে, কিন্তু ওই যে শেখ মুজিবের ডাকে আওয়ামী লীগে এসেছিলেন আর নড়েননি।

রাষ্ট্রনায়কোচিত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক বক্তৃতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রোতাদের শুধু পরিচিতি করানোই নয়, বরং তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। বঙ্গবন্ধু কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সাধন করেছিলেন তাঁর এ বক্তৃতার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর প্রোৎসাহমূলক বক্তব্য- "তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি

হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।" সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এ বক্তব্যকেই হুকুমনামারও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ বলে সেদিন গ্রহণ করেছিল। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণের সময়ও তাঁর মানসিক উদারতার কোন হেরফের কখনও সে ঘটেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৭ মার্চের ভাষণ। রাষ্ট্রের জন্ম-মৃত্যুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েও তিনি "আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব" বলার সাথে সাথেই আবার আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন, "তোমরা আমার ভাই-তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।" কঠিনের সাথে কোমলের এমন সহাবস্থান উদার-হৃদয় বঙ্গবন্ধুর মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল।

যথাযথ তথ্য চয়নের ফলে বক্তৃতাটি অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ হয়েছে, তার তীক্ষ্ম যুক্তি বিন্যাসের কারণে শ্রোতাদের মাঝে তীব্র প্রণোদনা সঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়- "যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছে বহিঃশত্রুর আমন্ত্রণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য-আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর গুলি হচ্ছে। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।" সহজ ভাষায় এ ধরনের জোরালো যুক্তিবাদ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এ সহজাত বিশেষত্ব। বক্তব্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে সূচনা বক্তব্যের সম্প্রসারণ বা পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয় আজকাল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আশ্চর্যরকমভাবে এ দিকটিও প্রতিভাসিত। যখন তিনি বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে বলেন, "তাকে আমি বলেছিলাম জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।"

অন্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গেলেও বঙ্গবন্ধু 'Put up the attriution first'- এর নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। বক্তার নাম প্রথম উল্লেখ করেছেন। যেমন- 'ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না' কিংবা "ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন। তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম" ইত্যাদি। সার্বজনীন ভাষণের একটি প্রধান দায়িত্ব কর্মসূচি নির্ধারণ (agenda setting sunction) যা বঙ্গবন্ধুর এ বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে বারবার। কিন্তু কঠোর কর্মসূচি

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এরকম বহু আত্মত্যাগী আওয়ামী লীগের আছেন, যারা দল করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন কিন্তু এখনো দল করছেন। নেতারা অবশ্য তাদের খবর রাখেন না। এছাড়া শেখ মুজিব তাঁর সাথী হিসেবে এমন ব্যক্তিদের পেয়েছেন যাদের সাহায্য ছাড়া তিনি হয়তো ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছুতেও পারতেন না। ফলে আওয়ামী লীগ বড় হয়েছে, ছয়দফার পর তা আরো বিস্তৃত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিব ও অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠেছেন। আত্মবিশ্বাস আর সাহসও ছিল তাঁর। দলের ব্যাপ্তি, মানুষের প্রতি ও নিজের প্রতি আস্থা তা আরো বাড়িয়েছিল। সে কারণে ছয়দফাকে একদফায় পরিণত করতে পেরেছিলেন। আর এটিই ছিল তাঁর অস্পষ্ট ছবি বা স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে যে তিনি অবিচল ছিলেন, সঙ্গে এবং এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস ছিল তা ফুটে ওঠে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ মামলা চলাকালীন একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। প্রধান আসামি শেখ মুজিবের পাশে তিনি বসা। আদালতে কথা বলা নিষেধ। শেখ মুজিব কয়েকবার ফয়েজ আহমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন কিছু একটা বলার জন্য। ফয়েজ আহমদ বললেন, "মুজিব ভাই, কথা বলতে মানা। মাথা ঘোরাতে পারছি না। বের করে দেবে।" তক্ষুণি উত্তর আসল যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে, "ফয়েজ, বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে হবে।"... তখন তিনি (বিচারক) জানতেন না যে, শেখ মুজিবের এই প্রতীকী উচ্চারণ একজনের জন্যে নয়, সমগ্র দেশের জনগণের মধ্যে অগ্নিপ্রজ্বলনের বাণী স্বরূপ। ১৯৭২ সালে, পাকিস্তান থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশে ফিরলেন শেখ মুজিব। এখন তাঁর ভূমিকা আর আন্দোলনকারীর নয়। এখন তাঁর ভূমিকা যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন 'সোনার বাংলা'র তা পূরণ করার এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত সে লক্ষ্যেই অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছেন। ওই সময়ের মধ্যেই দেশের পুনর্গঠন শুরু হয় এবং আমরা সংবিধান লাভ করি।

বঙ্গবন্ধু বা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল দেশকে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান। আর কোনো দেশে এরকম একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এত দ্রুত একটি শাসনতন্ত্র প্রদান সম্ভব হয়েছে বলে জানা নেই। এ শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছিল, তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা খানিকটা র‍্যাডিক্যালও বলা যেতে পারে। শাসনতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ ছিল-গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। মূলত: মুক্তিযুদ্ধ যে ক'টি কারণে হয়েছিল শাসনতন্ত্রের মূলনীতিতে তাই বিধৃত হয়েছিল– বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতা। যে কারণে, প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রথমেই

মূলনীতিসমূহ, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আঘাত হেনেছিলেন। এছাড়া শাসনতন্ত্রে বিধৃত হয়েছিল একজন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও এছাড়া শাসনতন্ত্রে বিধৃত হয়েছিল একজন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ, রাষ্ট্রের দর্শন। অন্যকথায় এভাবে বিষয়টি দেখা যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। আর ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রের বিধৃত হয়েছিল সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ। এককথায় এই শাসনতন্ত্র বাংলাদেশে সিভিল সমাজের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে পত্তন করতে চেয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু সপরিবারেই নিহত হননি, তাঁর সঙ্গে হত্যা করা হয় তাঁর বোনের স্বামী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও পরিবারকে, ভাগ্নে শেখ মনি ও পরিবারকে। বোঝা যায় প্রচণ্ড জিঘাংসা কাজ করেছিল, না হলে এরকম ঠাণ্ডা মাথায় এ ধরনের বর্বর কাজ করা যায় না এবং এ ধারণাও ছিল যে, ওই পরিবারের কেউ বেঁচে থাকলে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবেন। সে ধারণা যে ভুল ছিল না, তা পরে প্রমাণিত হয়েছে।

বিদেশে থাকায় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শেখ হাসিনাই হয়ে ওঠেন আওয়ামী লীগের নেতা এবং এখন আবার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন সিভিল সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। যেভাবে বঙ্গবন্ধু পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে তাতে এটি স্পষ্ট যে, এটি একটি দেশি ও অন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র যার পরিকল্পনায় দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা ঝুঁকি নিয়েছিল এবং সে ঝুঁকি সফল হয়েছিল। আওয়ামী লীগের একাংশ খোন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বের সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রমাণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক চারজন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় নেতা তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয় মোশতাকের আমলেই। মোশতাক ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সৌদি আরব, চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়। ফলে, এ হত্যাকাণ্ডে যে বিদেশি শক্তির হাত ছিল... এ তত্ত্ব একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। শেখ মুজিবের হত্যার প্রায় তিন দশক পর মানুষ আবার অনুভব করেছে শেখ মুজিব কী ছিলেন। কেন তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পেয়েছিলেন। মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে, তিনি বাঙালিকে বড় করতে চেয়েছিলেন, আর মানুষকে বড় করার একটি পথ নিরস্ত্র মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া। তাঁর হত্যার পর কতদল ও কতজন শাসন করল বাংলাদেশ কিন্তু মানুষের মন থেকে তো তাঁকে মোছা গেল না, যে চেষ্টা এখনো অব্যাহত। কারণ, আজ আমরা দেখছি, আমরা একবারই সে মর্যাদা

পেয়েছিলাম, সে পথ একবারই উন্মুক্ত হয়েছিল আমাদের জন্য ১৯৭১ সালে, যখন শেখ মুজিবুর রহমান নামে একজন নিরস্ত্র বাঙালির নেতৃত্বে আমরা সব ধরনের সশস্ত্রদের হটিয়ে দিয়েছিলাম। প্রাক... ১৯৭১ এবং ১৯৭১-'৭৫ এর ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশের সিভিল সমাজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবস্থান কোথায় আর অন্য কারকদের অবস্থান কোথায়। তাঁকে বাদ দিয়ে প্রাক ও উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। এ শতাব্দীর দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম বাঙলির জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। একজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন বাংলাভাষাকে রূপ দিয়েছিলেন, যাঁর গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত; অন্যজন বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন, সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন এ জাতির জন্য স্বাধীন এ ভূখণ্ডের, যার নাম বাংলাদেশ। এ জন্য আমি গর্বিত, আমরা উত্তরসূরিও হবে গর্বিত। বাঙালি ও বাংলাদেশ নামটিই বেঁচে থাকবে সে জন্য। আর এ কারণেই অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন–

"যতদিন রবে পদ্ম মেঘনা গৌরি যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা

আবুল মাল আব্দুল মুহিত

আগস্ট মাসটি দু'টি প্রজন্মের জন্য একান্তই শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের পনেরো আগস্টে এর শুরু। একটি দেশদ্রোহী দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী সেদিন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী ছিল পাকিস্তানের দোসর ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল। যে মহান বিশ্ববরেণ্য নেতা সব সময় ভাবতেন ও মাঝে মাঝে বলতেনও বটে, বাংলাদেশে কোন বাঙালি তাকে মারতে যাবে না, তারই শাহাদাত হয় কতিপয় পথভ্রষ্ঠ ভাড়াটে সৈনিকের হাতে। স্বাভাবিকভাবে এ জন্য গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলে এবং তাতে সহায়তা করে রাজনীতিবিদ, সেনাপতি এবং আমলাগোষ্ঠীর কিয়দংশ। সেদিন থেকে এই মাসটি হয় বাঙালির শোকের মাস। বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাড়ে তিন বছরের মাথায় ঘটে যায় একটি মারাত্মক ও ঘৃণিত প্রতিবিপ্লব। এই প্রতিবিপ্লবের প্রভাব থেকে দেশ আজও মুক্ত হতে পারেনি এবং এ মুহূর্তে চলছে জাতির মজ্জাগত মূল্যবোধ উদ্ধারের সংগ্রাম এবং গোটা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।

এই প্রতিবিপ্লবের অভিশাপ হিসেবে রাষ্ট্রীয় চরিত্র বদলের প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত। মানুষের ইহজাগতিক চেতনাকে কেন্দ্র করে যে জাতিটি গড়ে উঠেছে তাকে দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী পরাতে চাচ্ছে ধর্মরাষ্ট্রের খোলস এবং এই উদ্যোগে শুধু সুবিধাবাদীরাই লিপ্ত হয়, প্রধান ভূমিকায় আছে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রু জামায়াত, আলবদর ও আল শামস। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী শীক্তর ছত্রছায়ায় এই দানব ডালপালা মেলে এখন দাপটে ক্ষমতার কলকাঠি কব্জা করে নিয়েছে। তারা চালিয়ে যাচ্ছ তাদের বিধ্বংসী এবং অসভ্য কর্মকাণ্ড। শোকের মাসের গভীরতা এই দেশশত্রু গোষ্ঠী মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি করেছে গত সাড়ে চার বছরের দুঃশাসনের সুযোগে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্টে এই দেশশত্রুরা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতিভূ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক সমাজের পরিচয় চিহ্ন এবং উন্নয়ন ও সুশাসনের সার্থক প্রবক্তা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনাকে হত্যা

করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। উপর্যুপরি গ্রেনেড হামলায় বিকালের পড়ন্ত বেলায় মহানগরের জনাকীর্ণ এলাকায় শীহদ হন ২৪ জন নেতাকর্মী এবং আহত হন শ'পাঁচেক নিরীহ মানুষ। তবে দুষ্কৃতকারীরা তাদের মূল লক্ষ্য হাসিলে হয় ব্যর্থ। বঙ্গবন্ধু, তার পরিবার ও সহযোগীদের আঠারোজনকে হত্যা করেও দুর্বৃত্ত গোষ্ঠীর রক্ত পিপাসা নিবৃত্ত হয়নি। এবার তারা বঙ্গবন্ধু তনয়া ও তার সহযোগীদের হত্যাস্ত্র হাতে নেয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্টে এই দুর্বৃত্ত দেশ শত্রুদের আক্রমণ হয় আরও ব্যাপক, আরও বিধ্বংসী এবং আরও অর্থবহ। এবারে তাদের টার্গেট হয় আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজ সংগঠন। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র, একটি জেলা বাদে তেষট্টি জেলায় প্রায় পাঁচশ' এলাকায় হয় একই সময়ে ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ। দেশশত্রুদের সাহস কত? তারা জানিয়ে দেয় যে সারাদেশ ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে এবং তারা 'তাগুতি' শাসন উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করবে 'ইসলামী' শাসন।

তাছাড়া এই আগস্টেই ২০০৪ সালের ৫ ও ৭ তারিখে সিলেটে হয় বোমা ও গ্রেনেড হামলা। প্রথমদিনের টার্গেট ছিল আধুনিকতার নিদর্শন তিনটি প্রেক্ষাগৃহ। আর দ্বিতীয় দিনের টার্গেট ছিল আওয়ামী লীগের মহানগর কার্যকরী পরিষদ। এই দ্বিতীয় আক্রমণে জীবন দেন মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ইবরাহিম এবং কোনোমতে রক্ষা পান মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নগরপিতা মেয়র কামরান। ২০০৫ সালে এই আগস্টের ১৫ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি আহমদিয়া সম্প্রদায় বোমা ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। আবার ১৬ তারিখে মুন্সীগঞ্জে হিন্দুদের একটি মনসা মেলায় হয় বোমা আক্রমণ।

পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের পর জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তারই একটি চিত্রের সামান্য পরিচয় আমরা দেখছি। দুঃশাসনে দেশটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের কাতারে পৌঁছে যাচ্ছে। দুর্নীতিতে বছরের পর বছর আমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে চলেছি। ১১ সেপ্টেম্বরের (২০০১) পর পৃথিবীর কোথাও সন্ত্রাসের এমন বিকাশ সম্ভব হয়নি। এত বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা বা অগ্নিসংযোগের ঘটনা আর কোন দেশে এতটি হয়নি। সন্ত্রাসীদের হাতে এত মৃত্যু অন্য কোথাও হয়নি। এই সন্ত্রাসের বিশেষত্ব হল যে, এই সন্ত্রাসের টার্গেট মাত্র একটি গোষ্ঠী বা আদর্শ। শুধু আওয়ামী লীগ এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও এর কোন শিকার আমাদের সরকার বা জোট সদস্য বা তাদের কোন প্রতিষ্ঠান হয়নি। এই বিবেচনায় সহজেই বলা চলে যে, বর্তমান দুর্দশার বা সঙ্কটের আসল কারণ একত্রিশ বছর আগের বর্বর হত্যাকাণ্ড

এবং সামরিক বাহিনীর একাংশের দেশদ্রোহিতা ও হঠকারিতা। দুঃখের বিষয়, এই দেশদ্রোহিতা ও হঠকারিতার বিচার আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল জোট সরকারের চক্রান্তের ফলে। কিন্তু এই বাংলাদেশ তো আমাদের বাংলাদেশ নয়। এই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম মোলাকাত ১৯৪৭ সালের জুন মাসে সিলেটের বখতিয়ার বিবি বালিকা বিদ্যালয়ে। তবে পরিচয় হয় সম্ভবত ১৯৫৩ সালে আমি যখন সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র। ১৯৫৬ সালে আমার চাকরি জীবনের শুরু হয়। সেই সময় তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রী থাকাকালে কুমিল্লায় তার সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর সুযোগ হয়। ১৯৬১-'৬৩ সময়কালে তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো ফুটবল খেলার মাঠে। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকারে যোগদানের পর মুহূর্তের জন্য মোলাকাত হয় সময়ে সময়ে। ১৯৬৬ সালের মে মাসে পাকিস্তান সরকার তাকে প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে এবং কারাবাসে থাকাকালেই ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে তাকে আগরতলা-ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করে। এই মামলা জনতার রুদ্ররোষে খারিজ হয় ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাস্তবেই জেলখানা থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথি খানায় হাজির হলেন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের লক্ষ্যে আইয়ুব খানের আহূত গোল টেবিল বৈঠক। গোল টেবিলের প্রথম বৈঠক একদিনেই স্থগিত হল ঈদ পালনের জন্য। দ্বিতীয় অধিবেশন চলল ১০ থেকে ১৪ মার্চ। ওই একদিন আর পরবর্তী পাঁচদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সময় কাটানোর সর্বশেষ সুযোগ আমি পাই। তার দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম আমি। তার সঙ্গে পরবর্তী মোলাকাত হয় স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ১৯৭২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি। এই মহামানবের অধীনে নানা বিষয়ে কাজ করার সুযোগ হয় পরবর্তী সোয়া তিনটি বছর। আমার নির্ধারিত সরকারি দায়িত্বের গণ্ডির বাইরে নানা বিষয়ে কাজের সুযোগ তিনি আমাকে প্রদান করেন। তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ১৯৭৫ সালেই মার্চের শেষ সপ্তাহে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা বা বিবরণ আমি এই প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করব।

বঙ্গবন্ধু শুধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিলেন না। এই ভূখণ্ডের ইতিহাসে তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। আমাদের উপমহাদেশে সভ্যতার একটি প্রসূতি কেন্দ্র। সভ্যতার এখানে বিকাশ হয় উত্তর পশ্চিমে আমরি, কালীবাগান ও কোটজপি-বসতি এলাকায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২৩০০ অব্দে। একই সময়ে ছোট ছোট সভা বসতি হড়ে ওঠে কাশ্মীর উপত্যকায়, আসাম পাহাড়, মহিশুর ও মধ্যভারতে। পরবর্তী সময়ে আমরা পাই সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা সভ্যতা ও গঙ্গা উপত্যকার গাঙ্গেয় সভ্যতা। প্রায় হাজার বছর পর এদেশে

আগমন হয় মধ্য এশিয়া বা অমানাতোলিয়া থেকে আর্য জাতির। বাংলাদেশ ছিল গাঙ্গেয় সভ্যতার পূর্ব প্রান্ত বিশেষ। পূর্ণবর্ধন ও ওয়ারি বটেশ্বরে গাঙ্গেয় সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে। উপমহাদেশের তথ্যনির্ভর ইতিহাসের সূচনা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তখন থেকে আমরা দেখতে পাই ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট বসতি বা রাজ্যের একত্রীকরণ যাতে প্রথম হাজার বছরে বিশেষ অবদান রাখেন শ্রীগুপ্ত, রাজা শশাঙ্কা ও রাজা গোপাল। অত:পর দেখি বাংলা ভাষার বিকাশ যেখানে পুঁথি ও কাব্যসাহিত্য আধুনিক যুগে একটি সমৃদ্ধ ভাষার জন্ম দেয়। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাংলাকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণে অবদান রাখে পাল, সেন, ইলিয়াস শাহী, মোগল, কোম্পানি রাজ এবং ব্রিটিশ রাজত্ব। চিনা'র জগতে বিবর্তন নিয়ে আসেন অতীশ দিপঙ্কর, হযরত শাহজালাল, শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন রায়, ডি রোজারিও, হাজী শরীয়তুল্লাহ, স্যার সলিমুল্লাহ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ। এসব মহান জাতি ও রাষ্ট্র স্রষ্টার মেলায় আমরা পাই এক বিরাট মহীরূহ, বাঙালির অতি আপনজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। অনন্তকাল ধরে যে বাঙালি জাতি গড়ে উঠছিল তাকে জাতিসত্তা প্রদান করেন এই মহান নেতা। বাংলাদেশের তিনি স্থপতি ও জনক। এই বাংলাদেশকে নিয়ে তার ছিল সব চিন্তা-ভাবনা, কর্মোদ্যম এবং স্বপ্ন। তার জীবনের পরম সত্য ছিল 'আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। আমার দেশ আমাকে ভালোবাসে।'

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশের চিত্রটি হবে একান্তই মোটা দাগে। স্বপ্নের বাংলাদেশের প্রথম চরিত্র হল এটি একটি যৌগিক জাতির দেশ। এটি কোন সংশ্লেষী সত্তা নয়। এখানে নানা ধর্ম, নানা বর্ণ, নানা বিশ্বাস নিজস্ব স্বকীয়তার ক্ষেত্রটি ঠিক রেখে, এক দেহে হয়েছে লীন। সাম্প্রদায়িকতা এই দেশে জায়গা নেই। ধর্ম নিয়ে রাজনীতির জায়গা নেই এদেশে। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এই দেশে চলে না। ধর্মের নামে নির্যাতন-দমনও এখানে অচল। বাংলাদেশের সংবিধানে এরকম সমাজে নিশ্চয়তা তিনি প্রদান করেন।

তার দ্বিতীয় স্বপ্ন ছিল দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র চালু হবে। সেজন্য ইউনিয়নে, থানায়, জেলায় হবে জনগণের নির্বাচিত সরকার। প্রথম স্বাধীনতা দিবসে মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে জেলায় জেলায় সরকারের ঘোষণা তিনি দেন। জেলায় গভর্নর নিয়োগের ব্যবস্থারও লক্ষ্য ছিল স্বশাসিত জেলা কাউন্সিল।

তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিখাঁদ সার্বভৌমত্ব। ভারতের সেনাবাহিনীকে তিন মাসের মধ্যে তিনি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেন। বাণিজ্য কারও ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীলতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা ছিল তার নিরলস। চীন স্বীকৃতি দেয়ার আগেই সে দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যবস্থা তিনি করেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, দেশের সব সন্তান এক ধারায় মৌলিক শিক্ষা আহরণ করবে। সেজন্য সংবিধানেই যথোপযুক্ত দিকনির্দেশনা ছিল এবং প্রাথমিক শিক্ষা দ্রুত প্রসারের জন্য তিনি সমুদয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সরকারে ন্যস্ত করেন। উচ্চ শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করেন।

তিনি বলতেন যে বাংলাদেশ হল এশিয়ার সুইজারল্যান্ড। সুইজারল্যান্ডের প্রাচীন ঐতিহ্য নিরপেক্ষতা ও উন্মুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা তাকে আকর্ষণ করে।

বাংলাদেশকে তিনি জোট নিরপেক্ষ সংস্থায় নিয়ে যান। বাংলাদেশকে একটি ট্রানজিট স্থলভূমি এবং বাংলাদেশের নদীতে অবাধ নৌ চলাচলের তিনি ব্যবস্থা নিতে ব্রতী হন।

বাংলাদেশ নদী নিয়ে ছিল তার প্রচণ্ড আগ্রহ। তিনি বুঝতেন যে বাংলাদেশের সীমিত ভূখণ্ড বিশাল গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা অববাহিকার সব পানি নিষ্কাশন করে। তাই প্রধান নদীপথগুলোকে সর্বদা নাব্য রাখা ছিল তার স্বপ্ন। ড্রেজিং নিয়ে তার চিন্তাধারা ও জারিজুরি অনেক সময় প্রকৌশলীদের কাছে হয়ে যায় অসহনীয়। নদী, সেচ, পুল, বাঁধের যে কোন প্রকল্পে তার প্রথম প্রশ্ন থাকত, নদীশাসন ও ড্রেজিং।

ছাত্রাবস্থায়ই বঞ্চিত ও নিপীড়িতদের নিয়ে ছিল তার যত মাথাব্যথা। ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যলয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি নিয়ে আন্দোলনে তিনি শুধু জেলই খাটেননি, বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে বিতাড়িতও হন। স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার নির্দেশনা ছিল, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সরকারি বেতনের অনুপাত দশের চেয়ে বেশি হবে না। তার সময়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ছিল কৃষিখাতে, যেখানে দেশে পাঁচ ভাগের চার ভাগের কর্মসংস্থান হতো।

একটি সংহত অর্থনীতিকে তিনি উন্নয়নের পূর্বশর্ত মনে করতেন। এখন আমরা বিশ্বায়নের কথা বলি। তখন লক্ষ্য ছিল অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ সংহতি বৃদ্ধি, যাতে উৎপাদনের প্রতিটি উপাদান সহজে সারাদেশে বাজার খুঁজতে পারে। গ্রামীণ পূর্তকর্ম তাই তারা এজেন্ডায় ছিল সর্বাগ্রে। দেশে যখন যুদ্ধের ক্ষতি পুনর্নির্মাণের আয়োজন চলছে তখন জাপানি মিশনের কাছে তার দাবি হল, অতিসত্বর যমুনা সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। বাস্তবে তিনি যখন

প্রথম জাপান সফরে গেলেন ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে তখনই এই সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

একটি স্বল্পোন্নত, জনবহুল দরিদ্র দেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার ছিল তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। প্রথম সুযোগেই তিনি জাতিসংঘ পরিবারের সদস্য হতে জোর দেন। কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ সংস্থা, ইসলামী রাষ্ট্র সংস্থা সর্বত্র তিনি সদম্ভে পদচারণা করতেন। যখন সাহায্য সংস্থা গ্রুপ প্রতিষ্ঠার কথা উঠল সেই ১৯৭৪ সালে তখন তার দাবি ছিল যে, এই গ্রুপে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সবার প্রতিনিধিত্ব থাকবে। পূর্ব ইউরোপে দেশগুলো এবং পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশগুলোকে তিনি সচরাচর যে পশ্চিমী দেশের গ্রুপ হয় তাতে সম্পৃক্ত করতে জোর তদ্বির চালান। খুব সফল না হলেও অন্তত তেল উৎপাদনকারী দেশ এই গ্রুপে প্রথমবারের মতো সদস্য হয়। এ ব্যাপারে আমি নিজেই তার হুকুমে কতিপয় দেশে বিশ্বব্যাংকের আমন্ত্রণপত্রের পক্ষে তদ্বির করতে যাই।

দেশের সম্পদ জাঁকজমকে ব্যয় করা মোটেই তার সইতো না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল যে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে যখন তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশ ও বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করতে যান তখন তার সফরসঙ্গীদের অত্যন্ত সাদামাটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ওয়াশিংটনেও ব্যবস্থা ছিল এ-রকম, সেখানে অনেক সফরসঙ্গী বন্ধুবর্গের বাড়িতেও অবস্থান করেন। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে আমি একজন অতিথিকে নিয়ে ঢাকায় আসি। অতিথি তারই প্রতিষ্ঠানের খরচে ভ্রমণ করছেন। তিনি চট্টগ্রামে যাবেন, তাই হেলিকপ্টার চাই। প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারের জন্য অনুমতি দিতে আপত্তি করেন। আমি তার কাছ থেকে জানলাম যে, ওই রুশ হেলিকপ্টারে তেল খরচ ছিল খুব বেশি, তাই তিনি এটির ব্যবহার খুব কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন। একইভাবে মন্ত্রীদের বিদেশ ভ্রমণও তিনি শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন। আর সে যুগে অফিস-আদালতের বেশভূষা বা সুযোগ-সুবিধা সবই ছিল দেশে দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫৮ সালে আমেরিকায় এক সরকারি সফরে যান। মার্কিন সরকার উন্নয়নশীল দেশের নেতাদের তাদের দেশটি পরিভ্রমণে নিয়ে যেত এবং তারা সেখানে নানা রাজ্য, নানা প্রতিষ্ঠান, নানা প্রশাসন, নানা প্রতিনিধি পরিষদ, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে বেড়াতেন। বঙ্গবন্ধু এক সময় লস এঞ্জেলেস শহরে গেলেন এবং তিনি উঠলেন এমবোসের হোটেলে। প্রসিদ্ধ এই হোটেলে ১৯৬৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রবার্ট কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হন। এই হোটেলে একজন বাঙালি ছিলেন হিসাবরক্ষক। তিনি বঙ্গবন্ধুর

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন যার সাথে, তার নাম মুজিবুর রহমান হওয়ায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে। তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মাঝে মাঝে বাজারে ঘুরতেন। বঙ্গবন্ধু কোনখানে থামলেই বলতেন, 'মিতা, আমার দেশে কবে এমনটি হবে বলেন তো? কনজ্যুমার সোসাইটি না হোক হেসে খেলে দু'চারটে খেয়ে কাপড় পরে বাংলার মানুষ জীবনযাপন করতে পারবে। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্ন এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। সেজন্য যে জনহিতা নিবেদিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সে পথ থেকে তো আমরা অনেক দূরে। লুটপাট আর দুঃশাসন, দুর্নীতি ও অপশাসন হচ্ছে এই দুর্ভাগা দেশে বর্তমান পরিচয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নির্মাণের সুযোগ পান মাত্র সাড়ে তিন বছর। কিন্তু এই অল্প সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে দিকনির্দেশনা তিনি রেখে যান তারই যৎসামান্য এখানে বিবৃত হল। বাংলাদেশ নানা ঝড়-ঝাপটার মধ্যে সৃষ্টি হয়। তখন মানবাধিকার যুদ্ধাপরাধী, রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতা -এসব বিষয়ে সমকালীন চিন্তাধারা ও বিধি-নিষেধ সবই ছিল বাংলাদেশের বিপক্ষে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির রূপরেখা বানিয়ে যান সেইটিই কিন্তু আজও আমাদের জন্য সঠিক পথ। মাঝে-মধ্যে দলের স্বার্থে (দেশের নয়) আমরা নতজানু নীতি গ্রহণ করি কিন্তু প্রতিবারেই অবশেষে, আমাদের মৌলিক পক্ষেই ফিরে যেতে হয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক, মানবাধিকারের জন্য উচ্চস্বর, বঞ্চিতের জন্য বলিষ্ঠ উদ্যোগ, অর্থনৈতিক সম্পর্কে রাজনীতিকে পেছনে রাখা এবং যে কোন ক্ষেত্রে শান্তির সপক্ষে অবস্থান এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ, এসব মৌলিক নীতি বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করে যান। এখন আমাদের সামনে একটি পথ উন্মুক্ত। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে উদ্ধারের জন্য আমাদের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন অবলম্বন করতে হবে। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

লেখক : উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

এবিএম মুসা

একটি সদ্যোজাত স্বাধীন দেশ। সে দেশের সরকারি কোষাগারে কোন টাকা-পয়সা নেই। প্রশাসন নেই। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কোন সুসংবদ্ধ পুলিশবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনে নেই কোন অভিজ্ঞ সরকারি কর্মচারী, এমনকি কোন প্রশাসনিক অবকাঠামো নেই। শুধু মাত্র একটি ভৌগলিক সীমানা, একটি মানচিত্র, গর্ব করার মত একটি ইতিহাস আর একটি পতাকা নিয়ে যাত্রা শুরু একটি জাতির। সেই জাতির নেতৃত্বে একজন সর্বজনমান্য জননেতা যাঁর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে এই অগোছালো বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার। দেশটির নাম বাংলাদেশ, নেতার নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

গত ২৫ বছরের অধিককাল সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভর সকল কীর্তি আলোচিত হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদান স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু একটি দেশকে কীভাবে শূন্য থেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তা কখনো বিশ্লেষণ করা হয়নি। তাঁর ক্যারিশমা বা সম্মোহনী শীক্তর কথা বলা হয়, তাঁর সাংগঠনিক সাফল্যে প্রশংসা করা হয়, তাঁর নেতৃত্বের অবদান স্বীকার করা হয়। কিন্তু '৭২ থেকে তিনি কীভাবে প্রশাসনিক কর্তব্য পালন করেছিলেন, জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী ও পরের স্বল্পসময়ে রাষ্ট্রপতি দেশ গঠনে কী ভূমিকা পালন করেছেন সে মূল্যায়ন আজো হয়নি। বরং অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার হয়েছে অনেকে।

সাধারণভাবে শুধু একটি কথা বলা হয়, বিরাট সিংহ-হৃদয়ের অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসনের দায়িত্ব পালনে কঠোর হতে পারেননি বলে ব্যর্থ হয়েছিলেন। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি বিত্তহীন দরিদ্র মানুষের বোঝা তিনি কীভাবে টেনে নিয়ে গেছেন, শূন্যহাতে কীভাবে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ২৪ বছরের শোষণের পর ছিবড়ার মত ফেলে যাওয়া একটি দেশকে পুনর্গঠন করেছিলেন, সেই বিবরণী কখনো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয় না কেন, তা বুঝে উঠতে পারি না। সরকারি প্রচারযন্ত্রে শুধু তাঁর স্বাধীনতার

ডাকের কথা শুনি, দেশ গড়ার মহান কীর্তির বিবরণ বর্তমান প্রজন্মকে শোনানো হয় না। যারা শেখ মুজিবকে দেবতা বানানোর প্রচারণায় লিপ্ত, মানুষ শেখ মুজিবকে তারা সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে কেন? বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা এই সত্যটুকু শুধু প্রতিষ্ঠা করছি, একটি দেশের জন্মদাতা শুধু নন শক্ত জমিনের উপর এই দেশের ভিত্তি তিনি কিভাবে গড়ে তুলেছিলেন, সেই সত্যটুকু আজো অজানা রয়ে গেছে। এই ধরনের প্রচেষ্টাও লেখক, গবষক ও তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা কখনো করেননি।

এই পর্যন্ত একটি মাত্র বই আমি পেয়েছি যাতে প্রশাসক শেখ মুজিবের মূল্যায়ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বইটির নাম 'বাংলাদেশে' এরা অফ শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশে ও গবেষণাভিত্তিক লেখক। খুব বেশি আলোচিত হয়নি বইটির যদিও প্রায় ১৫ বছর আগে বইটি প্রকাশিত হয়েছে ও ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। অনেকে লেখকের নাম মওদুদ আহমদ ভেবে ভ্রুকুঞ্চিত করবেন, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে বইটি তথ্যবহুল ও অনেকাংশে যুক্তিনির্ভর। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের কার্যক্রম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা শুধু নয়, তাঁর কতিপয় তথাকথিত ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন '৭৪- এর দুর্ভিক্ষের সত্যিকার পটভূমির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, আবার যে রক্ষীবাহিনী নিয়ে এত সমালোচনা, সেই বাহিনী কেন ও কোন্ পরিস্থিতিতে গড়ে তোলা হয়েছিল তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, উদ্দেশ্য ও বাস্তবের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোথায় গরমিল রয়েছে। প্রশাসনিক শূন্যতার কথা আছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তথ্য রয়েছে, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে পদে পদে কোথায় বাধা ছিল, বিত্তের অভাব কী ছিল তার বিবরণী রয়েছে, অনেক জানা তথ্য ঝালিয়ে নেয়ার জন্য মওদুদের বইয়ের সাহায্য নিয়েছি বলেই তা উল্লেখ করেছি। প্রথমেই সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা যেতে পারে কী পর্বত প্রমাণ সমস্যা নিয়ে বঙ্গবন্ধু নতুন দেশের পরিচালনায় হাল ধরেছিলেন? সাধারণভাবে বলা যায় বঙ্গবন্ধুর সামনে যে সমস্যাগুলো প্রশ্নের আকারে দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে–

১. একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক উচ্চপদসমূহে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী। ইয়াহিয়া শাসনের শেষের দিকের মাত্র চার-পাঁচজন বাঙালি সিএসপি অফিসারকে কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রণালয়ে গুটিকয়েক বাঙালি সচিবও নিম্নতর পর্যায়ে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। একটি রাষ্ট্রের পরিচালনায় গুরুতর দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা ছিল অল্প কয়েকজনের। প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, এমনকি অর্থ ও

বৈদেশিক দপ্তর পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমলার অভাব ছিল। বঙ্গবন্ধু প্রায়ই বলতেন, একটি জেলা পরিষদ চালানোর অভিজ্ঞতা আছে এমন সব লোকজন নিয়ে তাকে একটি দেশ চালাতে হচ্ছে।

২. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়নের গুরু দায়িত্ব পালন ছিল অতি সুকঠিন। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার আর সমাজবিরোধীদের হাতে অস্ত্র হয়েছে। অপরদিকে পুলিশ বাহিনী সুসংবদ্ধ নেই, তাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। যারা রয়ে গিয়েছিলেন, পাকিস্তানি শাসকদের অধীনে চাকরি করতে বাধ্য হওয়ার কারণ মানসিক হীনমন্যতায় ভুগছেন। তদুপরি, সমাজবিরোধীদের তুলনায় তাদের সংখ্যা নগণ্য। এই পুলিশবাহিনী সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা জরুরী হয়ে পড়েছিল। এতে সময় নিয়েছে বলেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল।

৩. এক কোটি শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছিল, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ছিল পর্বত প্রমাণ একটি সমস্যা। যেখানে ভারতের মত একটি দেশ এদের দু'মুঠো আহারে ব্যবস্থা করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, সেখানে নি:স্ব একটি সরকারের কী সমস্যা হতে পারে এদের সামাল দিতে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পাকবাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে হাজার হাজার বসতবাটি, যার ফলে আরো এক কোটি মানুষ দেশে থেকেই গৃহহারা।

৪. রাস্তাঘাট নেই, দেশের প্রায় সবগুলো সেতু যুদ্ধের সময়ে হয় মুক্তিবাহিনী না হয় পাকসেনা ধ্বংস করেছে। নদীমাতৃক দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা এর ফলে সম্পূর্ণ ব্যাহত হতে বাধ্য। কোথা থেকে আসবে এসব পুনর্নির্মাণের জন্য হাজার কোটি টাকা, অথবা অস্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ফেরি বা পন্টুন সেতু?

৫. মুক্তিযুদ্ধের কারণে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে গিয়েছে, চোরাচালানির সুযোগ অবাধ হয়েছে। কীভাবে সীমান্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, এই প্রশ্নটিও বিরাট আকারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

৬. ভারতীয় সৈন্যের বাংলাদেশে অবস্থান একটি নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল কীভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে মিত্রবাহিনীকে ফেরত পাঠানো যাবে?

৭. একদিকে কয়েক লাখ বিহারি, অপরদিকে পাকিস্তানে আঁটকেপড়া কয়েক লাখ বাঙালি, এদের পুনর্বাসন নিয়ে যে জটিল সমস্যা, কীভাবে তার সমাধান হবে?

৮. মুক্তিযুদ্ধের পুনর্বাসন সমস্যা, এদের নিয়ে কী করা হবে তা নিয়ে চিন্তা -ভাবনা। এবম্বিধ সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধুকে এককভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। অপরদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অনেক সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেও পরে সঠিক অবস্থান থেকে সরে আসতে হয়েছে। যেমন প্রশাসনিক কার্যক্রম পাকিস্তানি আমলের আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ, বঙ্গবন্ধু প্রশাসনের উচ্চ পদে আমলা গোষ্ঠীর বাইরে কতিপয় নিয়োগ প্রদান করেছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে অধ্যাপক কবির চৌধুরী, গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ে ইঞ্জিনিয়ার মঈনুল ইসলাম, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ডা. টি হোসেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত সচিব পদে বাহাউদ্দিন চৌধুরীকে নিয়োগ প্রদান করেও তাঁদের সেখানে রাখতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনিক কার্যক্রম যারা সমালোচনা করেন তারা তৎকালীন আমলাদের ভূমিকা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন না। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল বছরখানেক আগে থেকেই। খাদ্যমন্ত্রী ফণী মজুমদারের ব্যর্থতা কতটুকু ছিল আর তার বিপরীতে কী ছিল খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পদে আসীন আমলার কার্যক্রম? উল্লেখ্য, চুয়াত্তরের এই আমলার বোধ হয় কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না, তাই জিয়াউর রহমান তাকেই খাদ্যমন্ত্রী পদে সমাসীন করেছিলেন। কারো কারো মতে, বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কর্মসূচি সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ করেছিল আমলাদের। কারণ জেলায় জেলায় তাদের ওপর খবরদারি করার জন্য রাজনৈতিক গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল। ইতোপূর্বে কালক্রমে উচ্চপদে যাদের বসিয়েছিলেন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, তাদের সরিয়ে দিয়ে আমলাতন্ত্রের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রশাসনিক বাধা-বিপত্তির বহু চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। তবে অর্থনৈতিক সঙ্কট যেভাবে সামাল দিয়েছিলেন তার যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের জন্য একটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ভৌত কাঠামো তৈরি করতে হয়েছেন শূন্য হাতে। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। ইরানের কাছ থেকে ভিক্ষে করে তেল আনতে হয়েছে, গম আর চাল এনেছেন ধার করে। মওদুদ আহমদ '৭৪- এর দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস ও পটভূমি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, এমনিতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছিল খাদ্য ঘাটতি এলাকা। তদুপরি '৭১-এর ডামাডোলে আর '৭২-এর কৃষি অবকাঠামো পুনর্গঠনে সময়ক্ষেপণের কারণে খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। একটি অনভিজ্ঞ সরকারের এমন একটি কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মত অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা ও লোকবল ছিল না। তিনি অবশ্য লিখেননি

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কথা। কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের অপরাধে যে বাংলাদেশকে শাস্তি দেয়ার জন্য মার্কিনি গমের জাহাজ সময়মত পাঠানো হয়নি এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কাহিনী সবারই জানা আছে। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের মূলে কি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ছিল না?

মধ্যপ্রাচ্যে তেল সঙ্কট অনেক দেশের মত বাংলাদেশকেও বিপাকে ফেলেছিল। বিশ্ব অর্থনীতি যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার ধাক্কা সামাল দেয়া কি সদ্য ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসা একটি দেশ ও তার সরকারের ও সরকার প্রধান শেখ মুজিবের জন্য সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল? তবুও তা সামলে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, কিন্তু কীভাবে তা কেউ ভেবে দেখেননি। রাস্তাঘাট, পুল তৈরি করতে হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দরের মুখে জাহাজ ডুবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিদেশী সাহায্য- তা পরিষ্কার করতে হয়েছে। বিমান আর সমুদ্র জাহাজ কিনতে হয়েছে, রেল রাস্তা আর জলপথে যোগাযোগ সুগম করতে হয়েছে। মোদ্দা কথা, একটি সদ্য বিবাহিত দম্পতির নতুন সংসার শুরু করার মত একটি নতুন রাষ্ট্রের সরকারকে সাজাতে হয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে, তহবিলে একটি পয়সাও ছিল না। এখনকার মতো বিদেশি সাহায্য আর ঋণের এমন অবাধ প্রবাহ ছিল না, তবুও বঙ্গবন্ধু তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় প্রভাব খাটিয়ে '৭৪-এ সাহায্যদাতা দেশগুলোর কনসর্টিয়াম গঠন করিয়াছিলেন। আজো আমরা সেই কনসর্টিয়ামের সুযোগ গ্রহণ করছি। তিনি বিদেশি সাহায্যের পাইপলাইন তৈরি করেছিলেন বলেই পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান বড় গলায় বলতে পেরেছিলেন 'মানি ইজ নো প্রবলেম।' বঙ্গবন্ধুর আড়াই বছরের প্রশাসনের সমালোচনায় দুর্ভিক্ষ, রক্ষীবাহিনী ও দুর্নীতির বিষয় বারবার উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার, পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা, পাকিস্তানি দালালদের ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার বিষয় খুব কমই উল্লিখিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানের আড়াই বছরের বাংলাদেশ সম্পর্কে শেষ কথাটি বলেছেন মওদুদ তাঁর গ্রন্থে। ভাবানুবাদ করে উদ্ধৃতি দেয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না, কারণ অল্প কথায় অনেক কিছু বলা হয়েছে বইটির সমাপ্তিতে- 'শেখ মুজিবের সংস্কারমূলক কর্মসূচিসমূহ, তার সকল প্রশাসনিক সফলতা ও ব্যর্থতা আলোচনা সমালোচনা বিবেচনা করেও একটা সত্য ভাস্বর হয়ে থাকবে, তিনি পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে একটি জাতিকে চিরদিনের জন্য গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত করেছিলেন। পাকিস্তানি কারাগারে নিহত হলে তিনি হয়তো শহীদ হয়ে অবিস্মরণীয় হতেন, কিন্তু বাংলাদেশে ঘটত চরম অরাজকতা ও হানাহানি।

খণ্ড-বিখণ্ডিত হত দেশটি। এ সত্যটিও মনে রাখতে হবে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে অনেক জনপ্রিয় নেতাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারেননি। শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে, তিনি দেশ শাসনের দায়িত্ব নিয়ে সেই স্বাধীনতাকে বিপদমুক্ত করেছিলেন। অন্য কারোর পক্ষে এই দুরূহ কাজটি করা সম্ভব হত না। তিনি দেশে ফিরে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু একটি মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ রেখে গেছেন।' বাংলাদেশ প্রথম আড়াই বছর দেশের ও জনগণের জন্য প্রশাসক শেখ মুজিবের এ হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো অবদান।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

মুজিব মানেই বাংলাদেশ

আশীষ-উর-রহমান

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল সকাল থেকে। তবে খুব ভারী নয়। আকাশ ধোঁয়াটে মেঘে ঢাকা। এ বৃষ্টি সহজে থামার নয়। বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জের কাপড় ব্যবসায়ী আফজাল হোসেন হাওলাদার তাই সময় নষ্ট করতে চান না। শুক্রবার রাতে তিনি গোপালগঞ্জে এসে উঠেছিলেন আত্মীয় বাড়ি। গতকাল শনিবার সকালে ই-বাইকে করে গোপালগঞ্জ শহর থেকে সোজা চলে এসেছেন টুঙ্গিপাড়ায়। মধ্যবয়সী এই ব্যবসায়ীর এবারই প্রথম এখানে আসা। সঙ্গে এসেছে বন্ধু সমর পাণ্ডে। হাতে ডিজিটাল ক্যামেরা। বঙ্গবন্ধুর প্রমাণ আকারের ছবির পাশে দাঁড়িয়ে আফজাল বন্ধুকে বলছিলেন, 'ছবিখান ভালো করে তুলবি। মাইনষেরে যে কত ভালোবাসিছে। তারে এমন খুন করল! আমরা এখন তারে কী দিয়া ভালোবাসি, বল দেকিনি।' কেমন যেন অস্থির মনে হলো আফজালকে।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধের পূবদিকের প্রধান ফটক পার হলেই মসজিদ চত্বর। উত্তর দিকে মসজিদ। চত্বরে শামিয়ানা টানানোর কাজ চলছে। পাশেই ক্যাফেটেরিয়া। দক্ষিণে কয়েকটি হালকা খাবারের দোকান ও উন্মুক্ত মঞ্চ। পশ্চিমে দোতলা পাঠাগার ভবন। তার নিচের তলায় বইয়ের সারি সারি র‍্যাক। ওপরের তলায় সংগ্রহশালা। দেয়াল জুড়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন সময়ের ছবি। এর পাশাপাশি আছে মুক্তিযুদ্ধের ছবি। একদিনের দেয়াল জুড়ে পলাশীর যুদ্ধ থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের কালানুক্রমিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র। এখানেই বঙ্গবন্ধুর ছবির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন আফজাল হোসেন। কেবল ছবিগুলোই নয়, তাঁর আবেগতাড়িত হওয়ার আরও একটি কারণ সম্ভবত ঘরের উত্তর দিকের কাঁচের আচ্ছাদনে ঢাকা একটি বিশালকার কফিন। কফিনের ওপরে সাদা কালিতে দুই লাইনের লেখা 'কফিন/বঙ্গবন্ধু'। আফজাল বলছিলেন, 'কফিন রাখিছে। সেই বন্দুকটিও রাখতি পারত। যে বন্দুকের গুলিতে বঙ্গবন্ধু শহীদ হইছেন।' আফজাল

সরাসরি রাজনীতি করেন না। স্রেফ বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসেন। এতদিন তিনি টুঙ্গিপাড়ায় আসেননি। কারণ বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছে, তারা দিব্যি বেঁচেবর্তে সুখে-শান্তিতে আছে-এই দুঃখ-ক্ষোভ থেকে। খুনিদের কয়েকজনের অন্তত সাজা কার্যকর হওয়ায় এবার খুশিমনে এসেছেন শ্রদ্ধা জানাতে।

বৃষ্টির মধ্যেই সমাধি চত্বরে জাতীয় শোক দিবসের প্রস্তুতির কাজ চলছিল। টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কার্যালয় থেকে সোজা একটি রাস্তা চলে গেছে বঙ্গবন্ধুর সমাধির প্রধান প্রবেশপথের সামনে দিয়ে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও রয়েছে দুটি প্রবেশপথ। সেনা, র‍্যাব, পুলিশের কড়া প্রহরা প্রতিটি পথে। তবে গতকাল সমাধি প্রাঙ্গণে আসতে কোনো অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয়নি। আশপাশের বাসিন্দা ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে বঙ্গবন্ধুর ভক্ত, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, মন্ত্রী ও সাংসদেরা এসেছিলেন।

প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলে মসজিদ চত্বর পার হয়ে লম্বা ইট বিছানো পথ দিয়ে বেশ খানিকটা এগোতে হবে। দুই পাশে ফুলগাছের সারি। বাঁধানো পুকুর। গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে টিনের দেয়াল, টিনের ছাউনি দেয়া স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ি। তারপর চোখে পড়বে সমাধির গম্বুজ। সামনে নারকেল ও কড়ইগাছ। উত্তরদিকে বাগানবিলাসের ঝাড়। পশ্চিমে বাঁশের কেয়ারি দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটি চমৎকার বাগান। পাশেই তিনতলা ঘর। এখানেই ছিল বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক বাড়ি। সেটি ছিল টিনের ছাউনি দেয়া আধাপাকা ঘর। পরে সেখানে বঙ্গবন্ধু একটি একতলা পাকাঘর করেছিলেন। এর সামনেই এখন বাবা-মায়ের পাশে তাঁরা চিরকালে শয্যা পাতা। মন্ত্রিসভার সদস্যরা সেখানে গতকাল পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন বেলা একটায়। তিন বাহিনীর একটি দল গার্ড অব অনারের চূড়ান্ত মহড়া করল। মহড়ার বিউগলের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছিল ভেজা বাতাসে। আবদুল হাই শেখের বাড়ি থেকে সেই শব্দ বেশ শোনা যায়। ঘরেই ছিলেন তিনি। অসুস্থ বলে চলাফেরা একরকম বন্ধ। তিনিই তো বঙ্গবন্ধুর কফিন কাঁধে করে বয়ে এনেছিলেন থানার সামনে থেকে। হাসপাতালে থেকে রিলিফের শাড়ি এনে তাঁর পাড় ছিঁড়ে কাফন তৈরি করেছিলেন। গোর দিয়েছেন নিজ হাতে। খুনিদের ফাঁসির পর এই প্রথম বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু দিবস পালিত হচ্ছে। শোকের দিনেও এবার তাই আনন্দই হচ্ছে তাঁর, কারণ 'খুনিদের ফাঁসি দেখে যাতি পালাম'। 'মোট ২৯ টে গুলি লাগিয়েছে গায়ে'। আবদুল হাই শেখ তখন ২২ বছরের যুবক। চাকরি করতেন টুঙ্গিপাড়ায় হাসপাতালের ওয়ার্ডবয় হিসেবে। বঙ্গবন্ধুই চাকরি দিয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মুন্নুজান বেগম জানালেন, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের ঘটনা। তাঁদের একটি রেডিও ছিল। ফজরের নামাজের পর রেডিওতে শুনলেন ঘোষণা

হচ্ছে, 'স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।' শুনে তো তাঁদের জান চমকে উঠেছিল। হত্যা না হয় করল, কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে 'স্বৈরাচারী' বলা হচ্ছিল কেন, সেটাই তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না। নানা সন্দেহ নিয়েই সকালে হাসপাতালে গেলেন তিনি। থানা থেকে খবর এল হাসপাতালেই থাকতে হবে। দুপুর দুইটায় থানার সামনে এলো হেলিকপ্টার। পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেছে। হাসপাতাল থেকে তাঁদের ১২ জন ওয়ার্ডবয়কে ডেকে নিয়ে থানার সামনে থেকে কফিনটি তুলে দেয়া হলো কাঁধে। চারপাশে সেনাবাহিনীর লোক। দারুণ ভারী কফিন। তাঁরা বয়ে আনলেন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে। পাশেই ছিল আইয়ুব মিস্ত্রির বাবার কারখানা। আইয়ুব ও তাঁর বাবাকে ডেকে আনা হলো কফিন খোলার জন্য।

ভেতরে ছিল বরফের বড় বড় চাকা। সেগুলো সরাতেই লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা বঙ্গবন্ধুর নিথর দেহ। গলার নিচ থেকে দুই পায়ের হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ২৯টি গুলির আঘাত। সবচেয়ে বড় ক্ষতটি ডানপাশের কোমরের কাছে। তাতে হাতের মুঠো ঢুকতে পারে এমন। বাঁ পাশ দিয়ে সেই গুলি বের হয়ে গিয়েছিল। বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ছিল একটি বড় ক্ষত। আর তাঁর সেই বিখ্যাত তর্জনী, যেটি উঁচিয়ে তিনি বর্জনিঘোষ কণ্ঠে কখনো ধমক দিতেন পশ্চিমা শাসকদের, কখনো বাঙালিকে দিতেন দিকনির্দেশনা-সেই তর্জনীটি ছিল না ডান হাতে। তবে সঙ্গে ছিল চশমা আর তাঁর পাইপ।

জানাজায় শরিক হয়েছিলেন ৩৯ জন। পুলিশ ধাওয়া করে এলাকা থেকে পুরুষদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। 'সাহসিকতা দেখায়ে কতক রইছেল। তারাই জানাজায় উপস্থিত ছেল,' বলছিলেন আবদুল হাই শেখ। তনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার একজন সাক্ষীও ছিলেন। ওই দিনে গ্রামে কারও বাড়িতে হাঁড়ি চড়েনি- বললেন আবদুল হাই শেখের স্ত্রী মুন্নুজান বেগম। তাঁর বক্তব্য সহজ: দেশের অন্য এলাকার মানুষদের চেয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁদের ভালোবাসাটা অনেক বেশি। সেই ভালোবাসার মানুষটিকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসমেত এক রাতে মেরে ফেলল- এই বেদনা তো ছিলই, উপরন্তু 'বঙ্গবন্ধু দেশে আইসলেও দেখতি পারলাম না' এমন অনুশোচনা সেই বেদনাকে করে তুলেছিল আরও গভীর।

টুঙ্গিপাড়াবাসীর সেই বেদনার ধারাই যেন বয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সমাধির অদূরে বাইঘা নদীর স্রোতধারায়। এই বাইঘাতেই কৈশোরে সাঁতার কেটেছেন সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই নদীর কোলেই এসেছেন ফিরে অন্তিম আশ্রয়ে। গোলাকৃতির সাদা দেয়াল দিয়ে সমাধিসৌধটি ঘেরা। দেয়ালটি নিরেট নয়। চার কোণ ফোকরের

বিশিষ্ট ঝালর আকৃতির। তার ওপরে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ। ভেতরে আট কোণ সমাধিক্ষেত্র। মেঝে কালো টালি বিছানো। পূর্বদিকে শেখ লুৎফর রহমান ও শেখ সাহেরা খাতুনের কবর পাশাপাশি। একটু পশ্চিম পাশেই ঘুমিয়ে আছেন তাদের ছেলে, বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান। আজ রোববার জনতার ঢল নামবে এখানে। মন্ত্রী, সাংসদসহ কত বিখ্যাত জন আসবেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে। গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়া অব্দি বহু কালো তোরণ, কালো পতাকা, কালো ব্যানার। তাতে লেখা 'ওরা ভেবেছিল মুজিবকে মারলে হয়ে যাবে সব শেষ/বুঝতে পারেনি ওরা মুজিব মানেই বাংলাদেশ।' সেই বাংলাদেশ জাগছে, তিনি আছেন হৃৎস্পন্দন হয়ে।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও আধুনিক বাংলাদেশ

সেলিনা হোসেন

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসেন। তাঁর ফেরার প্রতীক্ষায় ছিল দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তিনি বক্তৃতা মঞ্চে ওঠেন। শুরু হয় ভাষণ। এক পর্যায়ে বলেন, 'আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্যে কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করবে না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দিন এবং আমার অন্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।'

নিজের জাতিসত্তা এবং গণমানুষের আইডেনটিটির প্রশ্নে এমনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনবোধ। বিশ্বের কোনো আধুনিক রাষ্ট্রই নিজের আপন পরিচয়ের বাইরে থাকতে পারে না।

একমাত্র ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে নতজানু রাষ্ট্রই নিজ আত্মপরিচয়কে শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারে। বঙ্গবন্ধু তাঁর জাতিসত্তার পরিচয়ে ছিলেন আপসহীন। পাকিস্তান সরকারের নাকের ডগায় তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, বলতে হলে বাঙালির গণভোটের ব্যবস্থা করুন। তিনি সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন- দেশটির নাম রাখা হবে বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা লাভের আগেই তিনি দেশের নাম ঠিক করেছিলেন। তিনি দেশজুড়ে তাঁর ভাষণে অনবরত বলেছেন গণমানুষের অধিকারের কথা। দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাস করার

মৌলিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ জীবনে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে আশা করেছিলেন, এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত দেশে এক পরিত্রাণকর্তার দেখা পাবেন, যিনি মানুষকে মানুষের চরম আশ্বাসের কথা শোনাবেন। যে পরিপ্রেক্ষিতে থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্নের সঙ্গে আমরা বঙ্গবন্ধুর কথাই মনে করতে পারি । তিনি আমাদেরকে যেভাবে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, মানুষ হিসেবে মানুষকে যে আশ্বাসের কথা শোনাতে চেয়েছিলেন, এ দেশে এমন আর কে চেয়েছেন! দূরদর্শী রাজনৈতিক জ্ঞানের গভীরতম আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সে সময়ের পূর্ববঙ্গ নামের ভূখণ্ডে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাহসী বাঙালির অমিত বিক্রম যুদ্ধে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশ। রচিত হয়েছিল একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি।

ইতিহাসে তিনিই অমর যিনি সমগ্র জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন- ইতিহাস তাঁরই পক্ষে যিনি সময়ের বিচারে নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারেন। এ সংজ্ঞায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের সেই মহামানব সময় যাঁকে সৃষ্টি করেনি, যিনি সময়কে নিজের করতলে নিয়ে এসেছেন। যিনি কঠিন স্বরে নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিলেন সর্বকালের উপযোগী এবং সব দেশের জন্য প্রযোজ্য একটি অমর পঙক্তি 'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না'। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে এই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সামনে এই পঙক্তি একটি মৌলিক দর্শন। কোনো দেশই পদানত হয়ে থাকার ন্যূনতম শর্ত গ্রহণ করে না। বঙ্গবন্ধু জাতির সামনে এই অমোঘ পঙক্তি উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে বাঙালির জীবনে এই ঘটনার আর কোনো দিন পুনরাবৃত্তি হবে না।

তিনিই বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষদের মধ্যে সেই মানুষ যিনি ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে নিজ মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে তিনিই সেই মানুষ যিনি বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাঙালির এই বড়ো অর্জন তাঁর রাষ্ট্রীয় দর্শনের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের পর ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার শুরুতে বলেছিলেন, 'আজ এই মহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কাটি মানুষ আজ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।' তিনি আরো বলেছিলেন, "যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সে

আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।' এভাবে রাষ্ট্রের মর্যাদা, মানুষের মযার্দা তিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন: 'আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে। আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম।..... রাতে কেউ আসে না বলে কেউ কিছু বলত না। পুলিশরা চুপচাপ পড়ে থাকে, কারণ জানে আমি ভাগব না। গোয়েন্দা কর্মচারী একপাশে বসে ঝিমায়। বারান্দায় বসে আলাপ হলো এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে।... আবার ষড়যন্ত্র চছে বাংলা ভাষার দাবিকে নস্যাৎ করার। এখন প্রতিবাদ না করলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ উর্দুর পক্ষে প্রস্তাব পাস করে নেবে। নাজিমুদ্দীন সাহেব উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথাই বলেন নাই, অনেক নতুন নতুন যুক্তিতর্ক দেখিয়েছেন।.... সেখানেই ঠিক হলো আগামী ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে। আমি আরও বললাম, 'আমিও আমার দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব।'

মাতৃভাষার মর্যাদাকে তিনি রাজনৈতিক অধিকার বলে বুঝেছিলেন। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে ধ্বংস হয় মাতৃভাষার গৌরব। আজ বিশ্বের দরবারে ভাষার জন্য প্রাণদানকারী দিবস ২১ শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। ইউনেস্কো ঘোষণা দিয়েছে এই দিবস পালন করার জন্য। আধুনিক রাষ্ট্র তার অর্জনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মধ্যে দেখতে চায়। বাংলাদেশ সেই অর্জনে জয়ী হয়েছে। এই অর্জনের নেপথ্যে ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর অবদান স্মরণীয়।

'দুঃখী মানুষ' বঙ্গবন্ধুর জীবনে দুটি শব্দ মাত্র ছিল না। তিনি তাঁর কৈশোর-তারুণ্যের সূচনা থেকেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর অঙ্গীকার নিয়ে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে দরিদ্র বৃদ্ধ মানুষটিকে শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের গায়ের চাদর দিয়েছিলেন। গরিব ছাত্র বন্ধুকে ছাতা দিয়েছিলেন। অভাবের সময় অসহায় মানুষদের বাবার ধানের গোলা থেকে ধান দিতেন। এ সবকিছুই তাঁর কোনো তাত্ত্বিক ধারণা থেকে পাওয়া বিষয় নয়। তাঁর সহজাত প্রবণতার মধ্যেই বিষয়টি ছিল। স্বাধীনতার পরে সরকারের দায়িত্ব নিয়ে তিনি দেশ পুনর্গঠনের নানামুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে শুরু করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ভৌত কাঠামো ভেঙে

পড়েছে, শরণার্থীরা ফিরে আসতে শুরু করেছে, স্বজন হারানো মানুষের কান্না থামেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে তিনি অস্ত্র জমা নিতে থাকেন। যুদ্ধের সময় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করার জন্য রাস্তাঘাট, সেতু, রেললাইন ইত্যাদি পুনর্নির্মাণের কাজ শুরুর নির্দেশ দেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করেন। পল্লী বিদ্যুৎ চালু করেন। শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। নতুন দেশের যাত্রা শুরুর কাজটি তিনি সুচিন্তিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৭২ সালের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণীত হয়। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল এই সংবিধান মূলনীতি। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন হয়ে দেশে এসেছিলেন। লন্ডনে সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, পাকিস্তান কারাগারে আপনি যখন দেখলেন আপনার কবর খোঁড়া হচ্ছে তখন আপনার কার কথা মনে হয়েছিল? তিনি বলেছিলেন, দেশবাসীর কথা। দেশে এসে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, 'ইয়াহিয়ার কারাগারে আমি মরতে প্রস্তুত ছিলাম। কারণ, আমি জানতাম আমার বাংলার মানুষ মুক্ত হবেই। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশকে স্বাধীনতার জন্য এত অল্প সময়ে এত প্রাণ বলি দিতে হয়নি। আমি জানতাম তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে একটাই প্রার্থনা ছিল-তোমরা আমার মৃতদেহটি আমার সোনার বাংলায় পাঠিয়ে দিও।'

ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল তাঁর জীবনদর্শনের একটি অন্যতম দিক। ছাত্রজীবন থেকে তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। যেকোনো আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় এটি একটি মৌলিক শর্ত। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধলে তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় রিলিফের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বিপন্ন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভারতে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত ১৯৪৩ সাল থেকে থেকে ইসলামিয়া কলেজে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর 'ষাট দশক' শিরোনামের বইয়ে তিনি দাঙ্গার সময়ে স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন: 'ইসলামিয়ার ছাত্ররা যে আমাদের জন্য কতটা করতে পারত তার প্রমাণ পেলাম ১৯৪৬-এর রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। বালিগঞ্জ থেকে ইসলামি কলেজের রাস্তায় পদে পদে বিপদ। এই রাস্তায় আমাদের ছাত্ররা পার করে দিত। ওরা বালিগঞ্জের কাছে অপেক্ষা করত আর সেখান থেকে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে কলেজে নিয়ে যেত।

আবার সেভাবেই ফিরিয়ে দিয়ে যেত। এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ইসলামিয়া কলেজের সেইসব মুসলমান ছাত্রদের, যাঁরা আমাদের সাঙ্গে করে নিয়ে বিপজ্জনক এলাকাটা পার করে দিতেন। এইসব ছাত্রদের একজনের নাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান।'

১৯৬৪ সালের বাঙালি-বিহারি দাঙ্গার সময় তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছিলেন। নারায়ণগঞ্জে ভয়বহ সহিংসতার মধ্যে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দাঙ্গা-বিরোধী কমিটিতে থেকে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' লিফলেট প্রকাশ করে বিতরণ করেছিলেন। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' লিফলেট প্রচার করার দায়ে তাঁকে পাকিস্তান প্রেস অ্যাড পাবলিকেশন অর্ডিনেন্স এবং পাকিস্তান দণ্ডবিধি প্রয়োগ করে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে তিনি জামিনে মুক্তিলাভ করেন।

এভাবে সহসের সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মর্মমূলে ছিল মানবতার দর্শন। যেজন্য তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল নারী পুনর্বাসন বোর্ড। যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই কঠিন সমস্যা তিনি অনাবিল চিত্তে মোকাবেলা করেছিলেন। চেষ্টা করেছেন মেয়েদের সামাজিক অবস্থায় পুঃনপ্রতিষ্ঠা করতে।

অন্যদিকে নারীর রানৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে নারীদরে জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় নারীদের মন্ত্রিত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ আইন প্রণীত হয়েছিল। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমতার কথা উল্লেখ আছে। আজকের বাংলাদেশের স্বপ্ন সহিংসতা নয়, নারী-পুরুষের সমতার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য। কিশোর বয়স থেকেই তিনি মানুষের কথা ভেবেছেন। তাঁদের জন্য কিছু করার স্বপ্ন দেখেছেন। সেই বঞ্চিত মানুষদের কথা মনে রেখেই শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। এই লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি গঠন করেন নতুন রাজনৈতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ'। এই সংগঠনের ছোট নাম হয় 'বাকশাল'। এর জন্য আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। 'বাকশাল'কে দ্বিতীয় বিপ্লব বলে উল্লেখ করেন বঙ্গবন্ধু। 'বাকশাল'-এর মূল লক্ষ্য ছিল চারটি : ক) গণমুখী প্রশাসন খ) গণমুখী বিচার ব্যবস্থা গ) বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় এবং (ঘ) শোষিতের গণতন্ত্র।

মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ে তিনি যে বিপুল কাজ করতে চেয়েছিলেন সেটি ছিল পর্বতসমান। তারপরও তিনি সব চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে

যেতে ছেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। দেশি-বিদেশি চক্রান্তের সামনে বঙ্গবন্ধু নির্ভীক ছিলেন। নিজের জীবনের জন্য ভীত ছিলেন না। বাঙালি জাতিকে অবিশ্বাস করার মতো মানসিক দীনতাও তাঁর ছিল না। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'– কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অমর বাণীচিকে তিনি ধ্রুব সত্য মেনেছিলেন। সেজন্য নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ বাসভবন ছেড়ে সরকারি বাসভবনে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে থাকার কথা ভাবেননি। তাহলে তো গণমানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়। মানুষকে ভালোবাসার মূল্য দিয়েছেন নিজের জীবন দিয়ে।

আধুনিক রাষ্ট্রের মৌল চিন্তায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী এবং আধুনিক মনের অধিকারী। তিনি কখনো পশ্চাৎপদ মনোভাব নিয়ে দেশ ও জাতির ব্যাখ্যা করেননি। তাঁর সামনের সবটুকু ছিল প্রসারিত। তাঁর একটি অসাধারণ উক্তি 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়ে আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'

বঙ্গবন্ধুর ডায়রিতে একটি গান ছিল। তাঁর প্রিয় গান হিসাবে তিনি সেটি লিখে রেখেছিলেন।

love isn't love till you give it away
Love ins't love till it's free
The love in your heart
Wasn't put there to stay
Oh love isn't love till you give it away
You might think love is a treasure to keep
Feeling to chersh and hold
But love is a treasure for people to share
You keep it by letting it go.

এটাই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের অন্যতম দিন–Love is treeasure for people to share এই অসাধারণ গানের বাণী তিনি দর্শনে অনুরণিত করেছেন।

বঙ্গবন্ধু আজকের বাংলাদেশ, অর্জন ও সুরক্ষা

অজয় দাস গুপ্ত

অর্জনের চেয়ে সুরক্ষার প্রয়োজন বেশি আমাদের। এটা এখন চাক্ষুস। পরাধীন বঙ্গদেশে একের পর এক অর্জনের উজ্জ্বল ইতিহাস উজ্জ্বলতম অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ। তাও বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত। এতো সুখ বাঙালির কপালে সইলো না। একুশে, ঊনসত্তর, একাত্তরকে মেঘে ঢেকে দিতে এলো পঁচাত্তর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মর্মান্তিক প্রস্থান ও জেল হত্যার পর আমাদের জাতির পশ্চাৎমুখী যাত্রা আজ তার চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে গেছে। যে দিকে তাকাই অস্থিরতা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও প্রগতিশীলতার বিরোধিতা আর প্রকারান্তরে আওয়ামী লীগের নামে বাঙালি ও বাংলাদেশের গোষ্ঠী উদ্ধার। ভেবেছিলাম বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে লিখবো। লিখবো এখনো কেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হলো না? অতি উৎসাহী আর অতি নিন্দুকের ভিড়ে চাপা পড়া বঙ্গবন্ধু ইমেজ পুনরুদ্ধারের উপায় আমাদের অজানা কিছু নয়। তাছাড়া খালেদা জিয়া বা বিএনপি বাকি জীবন আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও বঙ্গবন্ধুর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

ইতিহাসের দু'রকম ধারা নিয়ে কার্ল মার্কস আগেই চলে গেছেন। একটি রাজ- রাজরা জমিদার বা একনায়কতন্ত্র, সামরিকতন্ত্রের ইতিহাস, গায়ের জোরে বিখ্যাত হওয়ার জন্য ইতিহাসকে বগলের তলায় রাখার অপচেষ্টা। পাক আমলে আমরা আইয়ুব খানকে দেখেছি, 'প্রভু নয় বন্ধু' লিখে বন্ধু হওয়ার পরিবর্তে জনগণের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। জিয়ার আমলে তাকে নিয়ে উচ্ছ্বাস আর আবেগ বেশিদূর গড়াতে না পারলেও ফলোয়াররা বেগমকে নিয়ে বেগম জিয়ার ভেতর দিয়ে যে খায়েস চরিতার্থে এখনো হাল ছাড়েনি। আর এরশাদ তো আছেই গান লিখে, কবিতা লিখে, কতো রকম ছদ্মবেশে যে ইতিহাসে জায়গা নিতে চাইলেন। কিন্তু যে কপাল সেই মাথা। অন্য ধারাটি জনগণতান্ত্রিক। মানুষই তাকে তুলে আনে। নিজের প্রয়োজনে সমাজের কারণে দেশের স্বার্থে। এর তিনটিই বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া এক কদমও এগুতে

পারবে না। অথচ তা জেনেও আমরা তাকে শ্রদ্ধাবঞ্চিত রাখতে ভালোবাসি। এক ধরনের আত্মঘাতী প্ররোচনায় তাকে ছোট করার মানসে কেকের ওজন বাড়ছে। পরিকল্পিত জন্মদিনের কেকটি কামড়ে যারা আজ তৃপ্ত একদিন এই কেক থেকে বেরিয়ে পড়া রক্তের স্রোতেই ভেসে যাবে তারা। এটাকেই বলে আসল ইতিহাস বা ইতিহাসের ম্যাজিক। আমি কোনো গায়েবী বা আজগুবি কথা বলছি না।

মোশতাকের কথা স্মরণ করুন, পুলিশ মিলিটারি পাকিস্তান, পেট্রো, আমেরিকা কেউই ক্ষমতায় রাখতে পারেনি। আমতো গেলোই পরে ছালা দেখলেও ভয় পেতো মোশতাক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন, আগামসি লেনের বাড়িতে শ'খানেক তালা ঝুলিয়েও নিজেকে নিরাপদ ভাবতে ব্যর্থ মোশতাক উন্মাদই হয়ে গেছিল প্রায়। এমনো জানা যায়, তিনি নিজের মল নিজেই খেয়ে ফেলতেন। অথচ কেউ তাকে ভয় দেখায়নি। কেউ তার জনসভায় একটি বোমা বা গ্রেনেডও ছোঁড়েনি কোনোদিন। উল্টো তারাই ফ্রিডম পার্টির নামে সন্ত্রাস আর বোমাবাজি চালাতো। জনপরিত্যাজ্য মোশতাকের নামও উচ্চারণ করে না কেউ। এই পরিণতি কেক কাটার দালালদেরও হতে পারে। কারণ তারা কোনো মৃত ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণা করছেন না, তারা প্রতারণা করছেন দেশ ও জাতির ইতিহাস ও অস্তিত্বের সঙ্গে। একইভাবে বঙ্গবন্ধুর নাম বিক্রি করে তাকে পুঁজি বানিয়ে নিজের আখের গোছানো সুবিধাবাদীরাও আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন। বিশেষত তাকে দলীয়করণের নামে মুখে ফেনা তোলা বাংলাদেশের নব্য সুবিধাভোগীরাও ইতিহাসের ক্ষমা পাবেন বলে মনে করি না। সে কারণে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অযথা লেখালেখি বা ভাবাবেগের প্রয়োজন নেই। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আছেন। যতো সময় যাবে তার ঘোর বিরোধীরাও তাকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হবে। এমন একদিন আসবে শামসুর রাহমানের কবিতার মতো বলতে হবে 'তুমিই আমাদের চেতনার ট্রাফিক আইল্যান্ড, যেখানেই যাই তোমাকে ঘুরে না যাবার কোনো পথ খোলা নাই।'

দুই. বলছিলাম অর্জনের চেয়েও রক্ষার বিষয়টি যেন প্রাধান্য পায়। এই যে গত কয়েক মাসের রাজনীতি ও সামাজিক বাস্তবতা এর প্রতি পরতে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অপমান আর অবমাননা। আমি খুব বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছি ধর্ম ও রাজনীতি হঠাৎ সমার্থক হয়ে প্রগতির বারোটা বাজাতে মাঠে নেমেছে। মধ্য বয়সী বাঙালির মনোজগতের দ্বন্দ্ব এখন অন্ধকারমুখী। সত্যি বলতে কি এমন কঠিন বাস্তবতা আঁচ করা গেলেও এতোটা উগ্র হবে ভাবা যায়নি। আওয়ামী লীগের যাবতীয় ব্যর্থতা আর অপকর্ম খতিয়ে দেখার পরও

এই উগ্রতার উত্তর মিলবে না। কারণ এই অন্ধকার মূলত সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্ম কেন্দ্রিক। পাকিস্তান ভাঙার যন্ত্রণাকাতর জামাত ও তাদের রাজনীতি এই ফাঁকটিই খুঁজছিল। কিন্তু কিছুতেই ফোকর গলে ঢুকতে পারছিল না। হঠাৎ সে সুযোগ ধরা দিয়েছে বটে কিন্তু তার সুফল ভোগ করছে বিএনপি। ফলে অর্জন সুরক্ষা বা দেশকে প্রগতির পথে রাখতে হলে ঐ দলের অপরাজনীতিক মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশ কেবল শত্রু-মিত্র আর দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের জন্য জন্মায়নি। ১৯৭১ সালের টাইমস লিখেছিল, বলা ভালো প্রচ্ছদের শিরোনাম করেছিল 'ইষড়ড়ফু ইরৎঃয' বলে। এই শব্দবন্ধের চেতনায় একদিকে যেমন রক্তস্নাত জন্মের প্রতি শ্রদ্ধা অন্যদিকে আমেরিকান বা সাম্রাজ্যবাদের তির্যক শ্লেষও আছে এতে। ভয় হয় এতো বছর পর কি সে আশঙ্কাই সত্য প্রমাণ করতে চাইছি আমরা?

তিন. বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ এ জাতীয় অস্তিত্বগুলো সংশয়াতীত-ভাবে সুন্দর ও নিষ্পাপ রাখতে হবে। আমাদের জাতীয় দায়িত্ব প্রগতির পক্ষ নিষ্কণ্টক রাখা, সাম্প্রতিক সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা মিতা হকের বক্তব্য নিয়ে যে ঝড় তাও ভয়ের। একদিকে যার যা খুশি বলা বা বলে খ্যাতি পাওয়ার অপচেষ্টা অন্যদিকে কিছু বললেই গ্রহণের পরিবর্তে, বর্জনের পরিবর্তে তা নিয়ে পানি ঘোলা করার অপপ্রয়াস। যে কোনো বিষয়ে ধর্ম ডেকে এনে আমরা আসলে কি প্রমাণ করতে চাইছি? এই প্রবণতা আসলে ধার্মিকতা নয়, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে অর্জন সুরক্ষায় রাজনীতিকে কৌশলী হতে হবে তবে তা মুক্তবুদ্ধি বা গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে নয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মেই সে শিক্ষা আছে এর চেয়েও ঘোর মৌলবাদ আর প্রবল প্রতিপক্ষকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। কিসের জোরে? প্রয়োজন প্রগতিশীল শক্তির। অন্যথায় বাংলাদেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবাটাও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপন শক্তিতে জেগে উঠতে না পারলে এই অন্ধকার দূর হবে না। এটাই ধ্রুব সত্য।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

সতীশ চন্দ্র সরকার

বাংলাদেশের স্থপতি, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের রূপকার, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ একসূত্রে গাঁথা। আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, গ্রেট ব্রিটেনের চার্চিল, রাশিয়ার মহামতি লেনিন, ভারতের মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধী, চীনের মাও সেতুং, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ঠুনকো ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ছিল মূলত বাঙালির শোষণ-বঞ্চনার লীলাভূমি। সেই প্রতিকূল পরিবেশেও পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণ থেকে বাংলাদেশকে বাঙালিদের মুক্ত করাই বঙ্গবন্ধুর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কবি গুরুর অমর সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', দেশাত্মবোধক গানে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ নামক একটা স্বাধীন সার্বভৌম অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপরেখা বঙ্গবন্ধুর অন্তরে অঙ্কুরিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ২১ নভেম্বর। নারায়ণগঞ্জ ছাত্রলীগ দপ্তর বাইতুল আমানে ছাত্রলীগ সম্মেলনে বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিব প্রায় ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট অনলবর্ষী ভাষণে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান না বলে বাংলাদেশ উচ্চারণ করে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে যে শিশুটির জন্ম, পরবর্তী জীবনে সেই শিশুটি যে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হবে, বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলবেন তা কেউ কি ভাবতে পেরেছিলেন! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়নকালীন সময়ে পাকিস্তানি শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য তার লেখাপড়ার ইতি ঘটলেও সংগ্রাম থামেনি এতটুকু। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন, ১৯৫২ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতার আন্দোলন,

১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার কাছে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, সেই ভাষণের মাঝেই লুক্কায়িত ছিল বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের আগ্নেয়গিরি। ৭ মার্চের পর পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সরকার ছিল না। সবকিছু ঘটত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে, অঙ্গুলি হেলনে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার প্রাগমুহূর্তে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু ফাঁসির আসামি হয়ে বন্দি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। তিনি জীবিত না মৃত তাও দেশবাসী সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারেনি। তবুও বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় তার চিরন্তন 'জয়বাংলা' শ্লোগান সঞ্জীবিত হয়ে সারাদেশের মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুজিবনির্ভর দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, তার 'বজ্রবণ্ঠ' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়মিত প্রচারিত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তারই প্রতিমূর্তির অলৌকিক পরশে পুরো মুক্তিযুদ্ধ সফলভাবে পরিচালিত হয়ে বিশ্বের মানচিত্র সবুজ জমিনে লাল-সূর্যের পতাকায় জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তাই বাংলাদেশের সত্তায়, গভীর নিবিড় বন্ধনে মুক্ত হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম সেই অনাদিকালের খাতায়। যেমন মহাত্মা গান্ধীর নাম যুক্ত হয়ে গেছে ভারতের অস্তিত্বের সঙ্গে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নাম পাকিস্তানের অস্তিত্বের সঙ্গে, হো চি মিনের নাম ভিয়েতনামের অস্তিত্বের সঙ্গে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন স্বদেশে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা তাকে সত্যিকার গণমানুষের নেতা হিসেবে মূর্ত করে তুলে। স্বাধীন দেশে তার নেতৃত্বে স্পল্প সময়ের মধ্যে রচিত হলো সংবিধান। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি গৃহীত হলো। সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণের মতো যুগান্তকারী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ অল্পকারের মধ্যেই রাজনৈতিক স্থিতিশীল ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতা হন। মার্শাল টিটো, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ নেতার সঙ্গে এ আন্দোলনকে কার্যকর ও বেগবান করার প্রয়াস চালিয়ে যান। আবার যুদ্ধ উন্মুত্ত বিশ্ব থেকে অশান্তি, হানাহানির দাবানল বন্ধে বঙ্গবন্ধু অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত হন। আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার

মানুষ হয়েও বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। ১৯৭৩ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ বৈঠকে বঙ্গবন্ধু বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথির মর্যাদা পান এবং বালাদেশ ওআইসির সম্মানিত সদস্য পদ লাভ করে। বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন। তার সময়ে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন মসজিদকে সরকারি সাহায্য প্রদানের নীতি গড়ে তুলেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে মদ, জুয়া, হাউজিসহ সকল প্রকার ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ইসলামবিরোধী ঘোড়দৌড় খেলা নিষিদ্ধ করেন।

বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এমনইভাবে ধর্মপ্রাণ মানুষের অন্তরেও চির ঠাঁই করে নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কাজেই বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে আলাদা করে কল্পনাই করা যায় না।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জনৈক বিদেশি ঐতিহাসিক যথার্থই মন্তব্য করেছেন প্রায় বারশ বছর পর বাঙালি জাতির পুনর্জন্ম হয়েছে এবং হাজার বছর পরে বাংলাদেশ এখন এক নেতা পেয়েছে, যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায় এবং জাতি বিচারে প্রকৃতই একজন খাঁটি বাঙালি। বাংলাদেশের মাটি ও ইতিহাস থেকে তার সৃষ্টি এবং তিনি বাঙালি জাতির স্রষ্টা। বঙ্গবন্ধু এ দেশকে, দেশের মাটি ও মানুষকে গভীর মমতায় ভালোবাসতেন, বিশ্বাস করতেন।

সেই বিশ্বাসের সুযোগে সামরিক বাহিনীর বিপথগামী কতিপয় কুলাঙ্গার জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে হত্যা করে। রাজনৈতিক হীনমন্যতায় বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করার অপপ্রয়াস চালানো হলেও ইতিহাসে তিনি অমর, অক্ষয় এবং অম্লান। যতদিন এই দেশ থাকবে, দেশের মানুষ থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু স্মরণীয়, বরণীয়, স্পন্দিত ও নন্দিত হয়ে থাকবেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়পটে, অন্তরের অন্তঃস্থলে। বাংলার আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে অনন্তকাল ধরে দিক নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা আর বাঙালি জাতিকে আশার দেদীপ্যমান আলোকছটা বিলিয়ে যাবেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও সমস্বরে বলতে চাই যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরী, মেঘনা বহমান ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

ফয়সাল শাহ

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই বাংলা চলে যায় ব্রিটিশের শাসনে। প্রায় ২০০ বছর চলে ব্রিটিশের শাসন ও শোষণ। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও পূর্ব বাংলা পরিগণিত হয় পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে। উপনিবেশ হিসেবে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রতি ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হয়। ব্রিটিশের শোষণ আর পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ চলাকালে জন্ম হয় অসংখ্য জ্ঞানীগুণী, মনীষী ও প্রতিভাবান রাজনীতিবিদের। তাঁদেরই একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯৩৮ সালে, ১৮ বছর বয়স থেকে। তিনি বাঙালি জাতির জনক, বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থপতি ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল শোষিতের গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। সুদীর্ঘ ৩৭ বছর তিনি একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়া এবং দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার স্বপ্নে ছিলেন বিভোর। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে প্রথম ধাপে জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে জেল-জুলুম সহ্য করে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। দ্বিতীয় ধাপে স্বাধীন দেশে সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশ পুনর্গঠন, কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদের সুষম বণ্টন ও দুঃখী দরিদ্র মানুষকে দেশের সম্পদের মালিকানায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শুক্রবার প্রত্যুষে প্রতিরক্ষা বাহিনীর কতিপয় বিশ্বাসঘাতক অফিসার ও জোয়ানের হাতে ঘটে সেই মহান সংগ্রামী জীবনের অবসান।

ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। বাংলার আর দশটি গ্রামের মতো এখানেও বিরাজ করতো শোষণ, নির্যাতন, অনাহার, মাহামারি ইত্যাদি। কুসংস্কার ছিল সর্বব্যাপী। দিগন্ত বিস্মৃত মাঠে ফসলের সমারোহে চোখ জুড়িয়ে গেলেও যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তা উৎপাদন করত। তাদের পেটে জ্বলতো ক্ষুদার আগুন। কারণ,

এই ফসল কৃষকের ঘরে যেতো না, যেতো জোতদারের গোলায়। 'ছায়া সুনিবিড়' এই গ্রামগুলো মোটেই 'শান্তির নীড়' ছিল না। এখানকার ৯৫ ভাগ মানুষের নিত্য সহচর ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য, মন্বন্তর ইত্যাদি। এহেন পরিবেশেই শেখ সাহেবের জন্ম। এ সময়ের স্মৃতি প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন "সে সময়েই আমি গ্রাম থেকে অভাব ও দারিদ্র্য দূর করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।" শৈশব থেকেই শেখ মুজিব ছিলেন নির্ভীক সাহসী ও দুর্বার। স্কুল জীবন থেকে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখেছিলেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দুই প্রদেশের মধ্যে গড়ে তুলেছিল ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য। পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গড় আয়ের ব্যাপক পার্থক্য। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের গড় আয়ের চেয়ে ৩২% বেশি। ১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় পূর্ব পাকিস্তানের গড় আয়ের চেয়ে ৬১% বেশি দাঁড়ায়। দেশের মোট বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ এবং বৈদেশিক সাহায্য অবৈধভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে উপেক্ষা করে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যবহার করা হতো। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের পণ্য রপ্তানি করে যে বৈদেশিক আয় অর্জিত হতো তা ব্যবহার করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য পণ্য আমদানির কাজে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিকনীতি বিশেষ করে আমদানিনীতি, এবং শিল্পায়ন এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল যাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বল্প মূল্যে আমদানি করা পণ্য অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হতো।

১৯৫০-'৫১ থেকে ১৯৫৪-'৫৫ পর্যন্ত ৬০% জনগণ অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য উন্নয়ন ব্যয়ের মাত্র ২০% বরাদ্দ করা হতো। উক্ত বৈষম্য থেকে জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক কনভেনশনে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। এই ছয় দফা দাবির তিনটি (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফা) অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রস্তাব গুলো ছিল নিম্নরূপ- তৃতীয় দফাঃ যদি এমন ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা যায় যাতে দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি পাচার রোধ নিশ্চিত করা যাবে, তবে সারা দেশেল জন্য একই মুদ্রা থাকবে। অন্যথায় (পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য) দুটি আলাদা মুদ্রার ব্যবস্থা করা হবে।

চতুর্থ দফা : কর নির্ধারণ ও আদায় অঙ্গরাজ্যসমূহের এখতিয়ারে থাকবে। ফেডারেল সরকারকে নির্ধারিত অর্থ দেয়া হবে।

পঞ্চম দফাঃ অঙ্গরাজ্য দুটি আলাদা আলাদা বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য নিয়ন্ত্রণ করবে। ছয়দফা ঘোষণার মাধ্যমে আসন্ন হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের পট পরিবর্তন। এক হয়ে গিয়েছিল নেতা ও জনতার স্বপ্ন, উদ্বেল হয়ে উঠেছিল বাঙালির স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে মুক্তি পাগল বাঙালির ঐতিহাসিক সমাবেশে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'। মূলত এটাই ছিল বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক।

'৭১- এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাঙালি সৈন্য, পুলিশসহ সকলকে পাস্তিানি হানাদার বিতাড়নে অস্ত্র ধারণের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাস-এ দীর্ঘ দশ মাস বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। তবু তার প্রেরণায় উজ্জীবিত জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ১৬ ডিসেম্বর সারা বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফিরে আসেন। রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু দেখতে পেলেন মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধে বাংলার জনপদের জনবসতির যে ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন করা হয়েছে, তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও কোনো দেশের শত্রুপক্ষ করেনি, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর এতটা পরিকল্পিত আঘাত আসেনি। পাকবাহিনী গ্রামের ঘর-বাড়ি স্কুলঘর, বিশেষ করে হাট বাজারগুলো পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেয়। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। নারী নির্যাতন করে চরম আকারে। যুদ্ধ নিয়মের বহির্ভূত এ ধরনের ধ্বংস পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ব্যাংকের টাকা পোড়ানো এবং সরকারি কেন্দ্রীয় ব্যাংক তহবিল শূন্য করে ফেলা, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা, খাদ্যগুদাম পুড়িয়ে দেয়া, কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলা, পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া, বাঙালির স্থলে বিহারি অবাঙালিদের নিয়ে সমাজগঠন, এসব ছিল বাঙালি জাতিটাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত যজ্ঞ।

সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে সমস্ত খাদ্যশস্য সেনানিবাসে স্থানান্তরিত করেছিল পরিকল্পিতভাব। ৯ মাস যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের জনগণের জন্য খাদ্য আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছিল। যুদ্ধের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ফসল বোনা সম্ভব হয়নি। ফলে স্বাধীনতার পরপরই দেখা গেল সরকারি খাদ্যগুদাম শূন্য। অন্যদিকে জেলা শহর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় সেনানিবাসে কত লক্ষ টন খাদ্যশস্য পোড়ানো হয়েছিল তার হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে সর্বত্রই খাদ্যশস্যের ছাই পাওয়া গেছে। পাকিস্তানিদের কত সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ছিল, তারা চট্টগ্রাম বন্দরটি সম্পূর্ণভাবে শুধু ধ্বংসই করেনি বন্দর থেকে বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রপথে মাইন পেতে রেখেছিল, ফলে খাদ্যশস্য নিয়ে জরুরিভিত্তিতে কোনো জাহাজ এসে যে আউটারে নোঙ্গর করবে সে উপায় ছিল না। তাছাড়া স্থলপথের রেল যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

সড়ক যোগাযোগও ধ্বংস করা হয়েছিল সেতুগুলো উড়িয়ে দিয়ে। খাদ্য পরিবহনকারী ট্রাক ও রেলবগিগুলো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর সামনে যে বিশাল দায়িত্বগুলো অবশ্যই করণীয় ছিল, তা হলো পুনর্গঠন। রাশিয়া পুনর্গঠন অথবা জাপান, জার্মানী পুনর্গঠনের চেয়েও যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ছিল আরও জটিল। রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক কোনদিক থেকেই বাংলাদেশের পুনর্গঠন কারোর জন্যই সহজ ছিল না। বাস্তব সমস্যাগুলো যা বঙ্গবন্ধুর সামনে ছিল সেগুলো মোটামুটি এই রকম:

যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে যাওয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন; বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান এবং তাদের ফিরে যাওয়া ব্যবস্থা; প্রশাসন গড়ে তোলা; আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ অন্য বাহিনীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের পুনর্বাসন; জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা; সড়ক, সেতু, রেললাইন পুনঃস্থাপন; দালালদের বিচার করা; বাংলাদেশে আঁকেপড়া পাকিস্তানি বিহারী এবং পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালি সরকারি-বেসরকারি জনগণকে দেশে ফিরেয়ে আনা; পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রভৃতি।

পুনর্গঠনের এই সময়সাপেক্ষ পদক্ষেপের পাশাপাশি স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথেই যে বহুবিধ সমস্যা নতুন সরকারের আশু মানোযোগ দাবী করেছিল, তার মধ্যে ছিল দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব, খাদ্যসামগ্রীর সীমিত সরবরাহ, বেকারত্ব আর ছিল লক্ষ লক্ষ সহায়-সম্বলহীন মানুষ আর দেশে প্রত্যাবর্তনকারী অগণিত উদ্বাস্তুর মিছিল। এই সব সমস্যার সমাধান যে কোন সরকারের জন্য ছিল দুঃসাধ্য। আর সম্পদ ও বৈদেশিক মুদ্রাবিহীন এবং

যথাযথ প্রশাসন যন্ত্রবর্জিত নতুন সরকারের জন্য এ ছিল এক অসম্ভব কাজ। স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু সরকার উপলব্ধি করেন যে, দেশে আগামী আমন ফসল পর্যন্ত ৩০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হতে পারে। সরাকরি গুদামসমূহ তখন প্রায় শূন্য। এমনকি দুমাসের মেয়াদে পূর্ণ ও সংশোধিত রেশন সরবরাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও ছিল না। খাদ্যের এই মজুদের পরিমাণ ছিল সর্বকালের জন্য ন্যূনতম। মজুদ মাত্রার এ অবক্ষয় ছিল দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগে এ দেশকে দেউলিয়া করে ছেড়ে দেয়ার ঐকান্তিক নীতির ফল। ফলে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। পরিকল্পনা কমিশন এবং সকল মন্ত্রণালয় কর্তৃক একযোগে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ সমস্যার মোকাবেলা করা হয়েছে। এজন্য ১৯৭১-'৭২ সালে বড় কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। বঙ্গবন্ধুর সরকারের পক্ষেই এই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার টেলিভিশনে ভাষণদান কালে কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "আমাদের সমাজে চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে।" কৃষির প্রতি বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধপরবর্তী দেশে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ পুনর্গঠনের যে কাজগুলো সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান হলো–১৩ মাসের মধ্যে কৃষকদের মাঝে ১০ কোটি টাকার ভর্তুকি ঋণ বন্টন;

৫ কোটি টাকার সমবায় ঋণ বন্টন; ৮৩ হাজার টন সার সংগ্রহ এবং ৫০ হাজার টন বিতরণ; ২ হাজার ১২৫ মণ বোরো ধানের বীজ সরবরাহ;

৫. ৩ হাজার মণ গম বীজ বন্টন; ১ হাজার ৭০০ মণ আলু বীজ বন্টন; সেচের জন্য ৯৪ টি গভীর নলকূপ বসানো; ৩ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০ অগভীর নলকূপ বসানো; ২০ হাজার পাওয়ার পাম্প সরবরাহ; ৮০ লাখ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; ২১টি ট্রাক্টর সরবরাহ করা; নাম মাত্র মূল্যে কলের ২১টি লাঙ্গল সরবরাহ করা হয়; ১ লাখ হালচাষের বলদ সরবরাহ করা হয় নাম মাত্র মূল্যে; ৫০ হাজার দুগ্ধবতী গাভী সরবরাহ করা হয় ভর্তুকি মূল্যে; রিলিফে ৪ হাজার ঢেঁকি দেয়া; ৫৩টি চাউল ও আটাকল স্থাপন এবং ২৯১টি পুনঃসংস্করণ করা হয়; এসব কাজ জরুরি ভিত্তিতে করার জন্য প্রায় ৯ হাজার নতুন লোককে চাকরিতে নিয়োগ করা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত হয়েছে। কিছু কিছু কার্যক্রম অনেক সময়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন আদৌ সম্ভব হয়নি। আমাদের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ কৃষি প্রদান করে অথচ সেই কৃষি ব্যবস্থা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে এটাই স্বাভাবিক। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার ৯৮ অধ্যাদেশের মাধ্যমে ভূমি সংস্কারের আমূল পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেন। ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধু সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো–

দেশের জমির মালিকানার ক্ষেত্রে যে অসম বণ্টন রয়েছে তা প্রতিরোধ করার জন্য জমির সর্ব্বোচ সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করা হয়। তবে চা বাগান, রাবার বাগান, সমবায় চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই সীমা শিথিলযোগ্য হবে। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি অধ্যদেশ জারির (১৫/০৭/১৯৭২)৬০ দিনের মধ্যে সরকারের কাছে হস্তান্তর করবে। উদ্ধৃত্ত জমি সরকার নিজ হস্তে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের (১.৫ একরে কম) মধ্যে বণ্টন করবে। বণ্টনের পর যাতে ১.৫ একরের বেশি জমি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা ১৪ এপ্রিল ১৯৭২ থেকে মওকুফ করা হয়। ১৪ এপ্রিল ১৯৭২ পর্যন্ত সকল বকেয়া খাজনা মওকুফ করা হয়। সরকার ইজারাদারী প্রথা বিলুপ্ত করেন। কৃষকদের কৃষি থেকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়। সেলামী ছাড়া জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করা। চর সম্পত্তির মালিক সরকার হবেন। নতুন কোন চর উঠলে ঐ চরের মালিক সরকার হবেন। ঐ সমস্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

অর্থনৈতিক পুনবার্সন ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পুনর্গঠন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংগঠন, প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল সৃজন, নতুন বিনিময় হার স্থিরীকরণ এবং সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজের উপযোগ অর্থব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন।

বঙ্গবন্ধু এমন একটি অবস্থায় দেশের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এক আনার বৈদেশিক মুদ্রা এবং গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। বরং পাকিস্তানিদের রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল। এমনি অবস্থা থেকে ব্যাংকে এক সুখপ্রদ স্বচ্ছল অবস্থা (liquidity position) সৃষ্টি করা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্বচ্ছন্দ মজুদ গড়ে তোলা ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক সাফল্য।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহন এবং যোগাযোগের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। মুক্তি সংগ্রামর কালে আমাদের অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সর্বাধিক। রেলপথ ব্যবস্থা সম্পর্কে একথা অধিকতর প্রযোজ্য। দুটো বড় রেলসেতু ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তর এবং দেশের একস্থান থেকে অপর স্থানে মালপত্রের পরিবহন গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্গঠন যেখানে অপরিহার্য সেখানে বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় দেশে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রেল লাইন স্থাপন করা হয়েছিল ৩০ মাইল, ৩টি রেল ইঞ্জিন মেরামত ও নতুন রেল ইঞ্জিন আমদানি করা হয়েছিল ২টি এবং রেল বগি আমদানি করা হয়েছিল ৭৫টি, রেল বগি সংস্কার করা হয়েছিল ৭০টি। এছাড়াও আমদানি করা হয়েছিল ৭৫টি আন্তঃজেলা বাস। ঢাকা শহরে চলাচলকারী বাস ২০টি, ৯৯টি খাদ্যশস্য বহনকারী ট্রাক, ৪০৩টি কার্গো ইঞ্জিন এবং ১৮টি অয়েল ট্যাংক লরি। ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম ও লালমরিনহাটের রেল ওয়ার্কশপ পুনঃসংস্কার ছিল তৎকালীন সরকারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি উপাদান হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সংকটের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সরকার বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। স্থাপিত উল্লেখযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো হচ্ছে খুলনায় ৬০ মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুকরণ, ঘোড়াশালে ৫৫ মেগাওয়াট করে দুটি ইউনিট স্থাপন, সৈয়দপুরে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং ভেড়ামারায় ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে ঋণ চুক্তি সম্পাদন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক স্থাপনকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩০০ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ সঞ্চাল লাইন ছিল ১৫০০ কিঃ মিঃ। ১৯৭১ সালে দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫৪৭ মেগাওয়াট। সেই অবস্থা থেকে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৪-'৭৫ অর্থ বছর শেষে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে আসেন ৬৬৭ মেগাওয়াটে। এতে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির হার গড়ে বছরে দাঁড়ায় ৬.৫%। কৃষিতে সেচ প্রদানে বিদ্যুৎ প্রয়োজন, শিল্প কারখানা বিদ্যুৎ ছাড়া চালানো মোটেও সম্ভব নহে, ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটির শিল্প, বাসা বাড়ি, অফিস আদালত প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। বিদ্যুতের এই অপরিহার্য প্রয়োজন অনুভব করে বঙ্গবন্ধু সরকার এর উৎপাদন এবং সঞ্চালনের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

স্বাধীন দেশে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর কাঁধে এস চেপেছিল একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি। সেদিন অর্থনীতির মৌলিক চাহিদা ছিল পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন। এর মধ্যে সোচ্চার কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল এরই ফলশ্রুতি হিসেবে এবং দেশে বিরাজমান হতাশা, অভাব-অনটন ও বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দেশের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদগণের সক্রিয় সহায়তা নিয়ে অথনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তিনজন সদস্য ছাড়া দেশের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ও উচ্চ শিক্ষিত আমলার কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮ প্রণয়ন সম্ভব হয়। জাতির জনক পরিকল্পনাটির মুখবন্ধে GK 'A loan for reconstruction and development of the economy taking into account the inescapable political, social and economic realities of Bangladesh' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলো হলো:

কর্মহীন বেকার ও অর্ধ বেকারদের কর্মসংস্থান তথা আয়-রোজগার নিশ্চিত করা। জাতীয় আয়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র নিবারণ। জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ অব্যাহত রাখা। বার্ষিক ন্যূনতম সাড়ে পাঁচভাগ হারে Gross Demestic Product (GDP) বৃদ্ধি। জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলাতে সক্ষম এমনি হারে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগপণ্যের সরবরাহ বর্ধন। সাধারণভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল রাখা। ফি বছর ন্যূনতম ২.৫ ভাগ হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা। সমাজতান্ত্রিক বিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখা। বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমানো। কৃষিক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রূপন্তরের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। শহরগামী স্রোত বন্ধ করা ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। দ্রুত উন্নয়নের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও পরিকল্পিত জনসংখ্যা নীতির প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন ও সামাজিক অঙ্গীকার আনা। অবহেলিত মানব সম্পদ ও মানব কল্যাণে উন্নয়ন ব্যয়ের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং শ্রমের যথোপযুক্ত ও দক্ষ বিনিয়োগ তথা শ্রমের চলমানতা নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুষম বণ্টন করা।

দারিদ্র্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি, মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি, এইচ এর গ্রোথ, উৎপাদন বৃদ্ধি এগুলোর কোন বিকল্প নেই– তাই এগুলো বৃদ্ধি ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। সবমিলিয়ে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি ছিল সমসাময়িক এবং একটি উৎকৃষ্ট উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক দলিল। এটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র বিলক্ষণ দূরদর্শী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সরকারের পক্ষেই।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, উৎপাদনভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তাঁর সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল কৃষি শিল্পসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষক শ্রমিকসহ সকলের আয় বৃদ্ধি করা। বঙ্গবন্ধুর উৎপাদন বৃদ্ধির এই লক্ষ্যের ধারণা পাওয়া যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত ভাষণের মাধ্যমে। ১৯৭২ সালে ১ মে তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সরকারি কর্মচারীদের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি, এই পদক্ষেপগুলো আপনাদের বর্তমান দুর্দশার কিছুটা লাঘব করবে। অবশ্য জনগণের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃত মান উন্নয়ন এই বেতন বৃদ্ধির ওপর কোন ক্রমেই নির্ভরশীল নয়। সেটা তখনই সম্ভব হয়ে উঠবে যখন আমাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত এবং কারখানাগুলি পুরো মাত্রায় চালু হবে। আমরা এ পর্যন্ত কোন নতুন কর, খাজনা ধার্য করি নাই। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, আপনাদের এই বেতন বাড়ানোর জন্য সরকারকে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৩০ থেকে ৩৫ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। কৃষকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে সুবিধা দেবার জন্য ইতিপূর্বে ৭০ কোটি টাকার বকেয়া সুদ খাজনা ও কর মাফ করে দেয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা এই ঘাটতি পূরণ করতে পারি।"

দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানির গুরুত্ব বেশি। যে দেশ যত বেশি পণ্য এবং সেবা অন্য দেশে রপ্তানি করতে সক্ষম হবে সে দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত বেশি উন্নত হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দেশের অধিকাংশ কল-কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিল্পের উৎপাদন অনেক কমে গিয়েছিল। দেশে দুটি বন্দরই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই অবস্থা থেকে সমস্ত কল-কারখানা, বন্দরসমূহের পুনর্গঠনের কাজ সমাপ্ত করে সরকারকে রপ্তানি প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়েছিল। এত প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও ১৯৭২'-৭৩ সালে সরকার

৩২১.৬৫ কোটি টাকার পণ্য ও সেবা রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছিল। যা নিঃসন্দেহে এক অকল্পনীয় সফলতা।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু, সরকার দেশের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কোন দেশের সাথে বাণিজ্যের জন্য উক্ত দেশের স্বীকৃতি প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু সরকার সাড়ে তিন বছরে বিশ্বের ১১৬টি দেশ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭২-'৭৩ সালে সরকারের নিজস্ব সম্পদ পরিধি কোন ক্রমেই এই উন্নয়ন, পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসনের জন্য নির্ধারিত অংশ অন্তর্ভুক্ত হবার মতো ছিলনা জেনেও বঙ্গবন্ধু সরকার ব্যাপক উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণের বাজেট প্রণয়ন করেছিলেন এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপানসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য প্রণীত তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পেশ করে বাংলাদেশকে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক সহায়তা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭২-'৭৩ সালের উন্নয়ন, পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন বাজেটের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল ৫০১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩১৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের খাতে। বাকি ১৮২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ নির্ধারণ করা হয়েছিল পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন খাতে। এখানে উল্লেখ্য যে, একটি শূন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার সম্পন্ন দেশের উন্নয়নে শুধু বাজেট প্রণয়নই নয় বাস্তবে তার প্রয়োগও ছিল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্র বিশেষ করে ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, সুইডেন, কানাডা, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক ও হল্যান্ড ইত্যাদি দেশ থেকে সাহায্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রায় ৪৬২.৬৬ কোটি টাকার যা মোট বাজেটের ৯০ শতাংশ। অনুরূপভাবে ১৯৭৩-'৭৪ সালেও উন্নয়ন, পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠনে ব্যয় করা হয়েছিল ৪০০ কোটি টাকা যা বাজেটের ৭৬% এবং ১৯৭৪-'৭৫ সালেও উক্ত ব্যয় করা হয়েছিল ৪৯৮ কোটি টাকা যা বাজেটের ৯৪%। একটি কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর সরকার তিন আর্থিক বছরের মধ্যে দুই বছরই সক্ষম হয়েছিলেন ৯২% বা তার অধিক উন্নয়ন বরাদ্দ বাস্তবায়ন করতে যা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের (১৯৭২-'৭৫) সাড়ে তিন বছর সময়ে চারটি বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছিল। এর তিনটি উপস্থাপন করেছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ এবং একটি উপস্থাপন করেছিলেন ড. আজিজুর রহমান মল্লিক। উক্ত সময়ে চারটি বাজেট উপস্থাপন করলেও বাজেট বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন তিনটি। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য অর্থমন্ত্রী বাজেটগুলো তৈরি করেছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে। বাজেটগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন পরিষ্কারভাবে জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা বঙ্গবন্ধু পরবর্তী সরকারগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭৩ সালের ১৪ জুন ১৯৭৩-'৭৪ সালের বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন "গত এক বছরে সকল দ্রব্যের তীব্র মূল্য বৃদ্ধি দেশের প্রতিটি মানুষকেই স্পর্শ করেছে। কেন এরকম মূল্য বৃদ্ধি হলো এবং মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা "খুঁটিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু সেই সঙ্গে গত এক বছরে দেশকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য।"

বঙ্গবন্ধু সরকার বাজেট তৈরিতে দরিদ্র মানুষের যাতে খুব একটা কষ্ট না হয় বা দরিদ্র মানুষ যাতে উপকৃত হয়, সে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন গুরুত্ব সহকারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সরকারের আর্থিক অনটন সত্ত্বেও সরকার সাধারণ গরিব মানুষের কর ভার লাঘব করার লক্ষ্যে সকল প্রকার সুতি বস্ত্রের ওপর বিদ্যমান শতকরা ৫০ ভাগ আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করেছিলেন। ৭০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় কমে যাবে জেনেও দরিদ্র্য কৃষকের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সরকারের বাজেটগুলিতে যে বিষয়টি বিশেষ লক্ষণীয় ছিল, তা হলো নতুন করে করের বোঝা না চাপানো। যে কথাটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু দেশের গরিব মানুষের ওপর করের বোঝা চাপাতে মোটেও রাজি ছিলেন না। রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে দেশের মানুষের যাতে কষ্ট না হয়, সে দিকে বঙ্গবন্ধু ছিলেন যথেষ্ট সজাগ। কর বিশেষ করে পরোক্ষ কর যেখানেই ধার্য করা হোক না কেন তার শেষ ভার দেশের সাধারণ গরিব মানুষের ওপর গিয়ে পড়ে। সম্ভবত সেই বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু কর ধার্যের ব্যাপারে ছিলেন যথেষ্ট সজাগ। ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারি প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "কলে-কারখানায় কাজ করতে হবে। কাজ করে মাথাপিছু আয় বাড়াও। নিশ্চয়ই তোমরা তবে অংশ

পাবে। কাজ করবে না, আর পয়সা নেবে– তা হবে না। কার পয়সা নেবে? গরিবের পয়সা নেবে? গরিবের উপর ট্যাক্স বসাব? খাবার আছে তার? কাপড় আছে তার? তার উপর ট্যাক্স বসাব কোত্থেকে? আমি পারব না। বঙ্গবন্ধুর রাজস্ব আয় সংগ্রহের এই নীতি এটিই প্রমাণ করে যে দেশের পুণনির্মাণ এবং পুনর্গঠনের কাজে ব্যয়ের জন্য প্রচুর রাজস্ব আয়ের প্রয়োজন হলেও দেশের সাধারণ গরিব জনসাধারণকে যাতে করে অধিক করের বোঝা বহন করতে না হয় সে বিষয়টিকে লক্ষ্য রেখেই কর ধার্যের পরিধি নির্ধারণ করেছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর। সেই স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে তিনি রাজনীতি করেছেন, জেল-জুলুম, অত্যাচার সহ্য করেছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্দোলন করেছেন। সেই আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে নয় মাসের মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু শুরু করেন দেশ গড়ার কাজ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেই একই ময়দানে ১৯৭২ সালের ১৯ আগস্ট ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐ ৭ মার্চের উক্তি সম্পর্কে বলেন, "স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু মুক্তি পেয়েছি কিনা জানি না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু ভেঙ্গে চূরমার করে দেয়া হয়েছিল। অর্থনৈতিক মুক্তি না আসা পর্যন্ত জনগণের মুক্তি নিরর্থক।" বঙ্গবন্ধু আরো বলেছিলেন, "সংগ্রাম করে স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু আজও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পাই নাই। যতদিন এদেশের দুঃখী মানুষ পেটভরে খেতে না পারে, যতদিন অত্যাচার ও অবিচারের হাত থেকে তারা না বাঁচবে, যতদিন না শোষণমুক্ত সমাজ হবে, ততদিন সত্যিকারের স্বাধীনতা আসতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনতে যে ত্যাগের প্রয়োজন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনতে তার চেয়ে বেশি কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছর পর আজ সময় এসেছে সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে তাঁর স্বপ্নকে মর্যাদা দেয়া।

বাংলা বাঙালি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

মমতাজউদদীন আহমদ

দর্শন ও শ্রবণ অযোগ্য স্থূল স্তাবক বাংলাদেশ টেলিভিশনকে অনেকেই কালো তালিকাভুক্ত করেছে। দেখে না বিটিভি, বিপদে পড়েও বিটিভি দেখতে দর্শকের রুচিতে বাঁধে। যত মিথ্যা আছে, যত মোটা দাগের সরকারি প্রচার আছে, সবই বিনা নীতিজ্ঞানে বিটিভি প্রচার করে চলেছে। এই মিথ্যা এবং অযোগ্য ব্যবস্থাটি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস চালু করেছে। শুনলাম, মহাসমারোহে ওলার্ল্ড সার্ভিসের উদ্বোধন করা হয়েছিল। যারা উপস্থিত থাকতে বাধ্য তারা নিশ্চয় ছিল। সরকারের প্রধানের লিখিত ভাষণ বরাবরের মতোই একই ভঙ্গিতে পড়া হয়েছে আর উপস্থিত থাকতে বাধ্য কর্মচারী ও মন্ত্রীবর্গ অতি বিস্ময় নিয়ে তাই গিলে গিলে খেয়েছে।

আরো শুনলাম, এই তথাকথিত বিশ্বপ্রচার অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়নি। যদি তাই সত্য হয়ে থাকে, তবে তো সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে গেল। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত কারো ব্যক্তিগত খায়েসের জন্য নির্বাচন করা হয়নি। দালাল আর স্তাবকদের জন্য জাতীয় সঙ্গীত বাজানো অন্যায় বা ভীতির কারণ হতে পারে। কিন্তু এ অনির্বচনীয় জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলার মুক্তিযুদ্ধ এবং রক্তের বন্যার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। আমার সোনার বাংলা শুনলেই যাদের পেট ব্যথায় এবং হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা লাগে তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় টিক্কাখান–ঝানঝুয়া খানদের সঙ্গে বসে মজা করে খানা-দানা খেয়েছে কিন্তু এ সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলার কৃষক মজুররা ট্যাক্স ও ভ্যাট দিয়েই সরকারি টেলিভিশন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখছে বা রাখতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলার কৃষক মজুর ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবীদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে টেলিভিশন কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা দেয়া হয়। কিন্তু এ ভাতা ও বেতনভোগীরা জোট সরকারের অনিচ্ছার সঙ্গে নিজেদের দাসত্ব মিশিয়ে দিয়ে বাংলার জাতীয় সঙ্গীত প্রচারকে স্থগিত করে দিয়েছে। এটা কি তারা সচেতনভাবেই করেছে, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকর্তাদের মনতুষ্টির জন্য? কেননা পত্রিকান্তে (জনকণ্ঠ) বলা হয়েছে যে, টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ যে প্রোগ্রাম ফাইনাল

করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল সেই প্রোগ্রামে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর কোনো উদ্যোগ ছিল না। তার পরিবর্তে জিয়াউর রহমানের অতিপ্রিয় আমার জীবন বাংলাদেশ মরণ বাংলাদেশ গানটির উল্লেখ ছিল, আর তাই চূড়ান্ত হয়েছে। সে জন্য ওয়ার্ল্ড সার্ভিস অনুষ্ঠানে 'মরণ বাংলাদেশ' বাজানো হয়েছে। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীতের কোনো এন্ট্রি রাখা হয়নি।

বাঙালি এবার হেসেছে। প্রাণ খুলে নির্মল হেসেছে। বহুকাল হল বাংলার মানুষ নিঃসঙ্কোচে হাসেনি, আনন্দও করেনি। কেন হাসবে? যখন প্রতিটি ঘরে ডাকাতি, চাঁদাবাজি আর অপহরণের অভিশাপের ছায়া ছড়িয়ে আছে, সেখানে অশ্রুভরা চোখ ও হৃদয় জুড়ে কান্নাই জমে থাকে।

তবু এবার পহেলা বৈশাখে বাঙালি হেসেছে। বদ্ধ ঘরে সমস্ত অবসন্নতা আর যন্ত্রণার অভিশাপকে কিছুক্ষণের জন্য ঝেড়ে ফেলে বাঙালি ঘরের বাইরে এসেছিল। এমন মানবসমুদ্র আর দেখা যায়নি। ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন বাঙালি উচ্চমূল্যেও পণ্যের পাথরের চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ঘরের মধ্যেই বন্দী থাকে। এবার সমস্ত বেদনা ও শঙ্কাকে তাড়িয়ে দিয়ে পথে নেমেছিল, পহেলা বৈশাখে।

এবারের পহেলা বৈশাখ এক বিশিষ্ট দিন ছিল। শুভ নববর্ষে এদিকে বাঙালি সাহস ও উল্লাসের সন্ধান পেয়েছে। এ দিন বিবিসি শ্রোতা জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম ঘোষিত হয়েছে। এ জরিপ নিরপেক্ষ, এ জরিপ তথাকথিত বেতনভুক্ত স্তাবক কর্মচারিদের দ্বারা পরিচালিত নয়। বিবিসি এমনই এক সংস্থা, যার সততা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করা দুরূহ। বাংলাদেশের দুঃসময়ে সৎ এবং সত্য সংবাদ শোনার জন্য শ্রোতারা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য আপামর বাঙালি বার বার বিবিসি শুনেছে। আর শুনেছে বিপ্লবী বাংলা বেতারের 'চরমপত্র' ও অন্যান্য অনুষ্ঠান।

সত্য শোনার এবং দেখার আগ্রহ মানুষের মনে চিরন্তন। সত্যের জন্য কাঙাল সকলে। তবে কিছু মোনাফেক এবং স্বাধীনতার দুশমনদের কথা আলাদা। তাদের শ্রবণযন্ত্রের মধ্যে কুকুরে লেজ ঢুকে বসে আছে। শতবার প্রেম বা পরামর্শেও তাদের কানের লেজ সোজা হবে না। তাদের কাছে ইয়াহিয়ার মতো চরিত্রহীন লম্পট এবং টিক্কাখানের মতো এক নৃশংস হায়েনার আচরণই সত্য। তারাই তাদের আরাধ্য সেনাপতি।

বিবিসি জরিপে কুড়িজন বাঙালিকে চিরকালের সেরা বাঙালি ঘোষণা করেছে। এতে যাঁদের নাম এসেছে তাঁরা চিরকালের ভাস্বর বাঙালি। বাংলাদেশি নয়, তারা বাঙালি। স্বঘোষিত কোনো বাংলাদেশী যদি জরিপে বাঙালি হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সে দায়িত্ব নেবে বিবিসির শ্রোতারা– তবে শ্রেষ্ঠ

বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাচন করে অসংখ্য শ্রোতা একটি চিরভাস্বর এবং অবিনশ্বর সিদ্ধান্ত দিয়ে রেখে ছিল।

তবে ভাল লেগেছে ভাষা আন্দোলনের চারজন শহীদকেও সেরা বাঙালির তালিকায় আনা। বাঙালির মর্যাদা, বাঙালির মহিমা নতুন করে নতুন প্রজন্মের কাছে আবার জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। একটি জাতির জন্যও জরিপ বড় দরকার ছিল। সর্বশেষ উজ্জ্বল সংবাদটি হল, বাংলার স্বাধীনতার প্রধান স্থপতি, স্বাপ্নিক, নির্ভীক এবং বাংলাপ্রেমী বঙ্গবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি।

আমাদের প্রার্থনা, হাজার বছর ধরে যে জাতি তার দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগ নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন রচনা করেছে, বাংলার গানে-কবিতায় এবং আচরণে সই অমৃত জাতি বার বার উজ্জ্বল হোক তার মহান মানুষদের নিয়ে।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও নাট্যাভিনেতা

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এস, এম নুরুল আমিন সরকার

বাঙালি, বাংলাদেশ আর মুক্তিযুদ্ধের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যার নামটি জড়িত তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মহাপুরুষ প্রতিদিন জন্ম নেন না। তারা আসেন যুগে যুগে। একজন মহামানবের জন্য একটি জাতিকে অপেক্ষা করতে হয় যুগ যুগ। বঙ্গবন্ধুর জন্য বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল দু'শ বছরেরও বেশি। পরাধীন ঘুমন্ত জাতিকে তিনিই প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখান। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম', তার এই বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠ সেদিন বাঙালি জাতিকে একটি বিন্দুতে এনে মিলিত করে। স্বাধীনতার অদম্য ইচ্ছায় পতঙ্গের মত জনতা সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে।

ফলশ্রুতিতে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধে বিজয়ী বাঙালি অর্জন করে একটি স্বাধীন ভূ-খণ্ড এবং গর্বিত জাতীয় পতাকা।

আসলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস। যে মহানায়কের জন্ম না হলে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের এ স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় কখনই হত না এবং বাঙালিরা একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্ব সভ্যতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো না।

আর যে স্বাধীনতা এবং লাল সবুজের গর্বিত পতাকা আমরা অর্জন করেছি সেই স্বাধীনতা কিন্তু একদিনে আসেনি। স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিটি ধাপে ধাপে যিনি সেনাপতির ভূমিকা পালন করেছিলেন, জাতিকে উপহার দিতে পেরেছিলেন একটি স্বাধীন ভূ-খণ্ড এবং লাল সবুজের পতাকা।

সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিটি জাতির ক্রান্তি লগ্নে একজন মহামানবের আবির্ভাব ঘটে। সেই মহামানবের হাত ধরে সেই জাতি জেগে উঠে। নিজের শৌর্য-বীর্যকে প্রকাশিত করে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর সিপাহী বিপ্লব, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা,

সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। কিন্তু অনেকেই সেই রক্তিম সূর্যের আভা দেখতে পারেনি। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তাদের তৈরি পথের পেছন হতেই একেবারে সাধারণ মানুষের কাতার থেকে জেগে উঠেন এক মহামানব। বাঙালি কেন সারা বিশ্বই অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সেই বিশাল মানুষটির দিকে। যেনো শতবর্ষের অপেক্ষার অবসান ঘটল।

বাঙালি ভুল করেনি সেদিন। তাদের আকাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বের সন্ধান পেয়ে অভিভূত বাঙালি জেগে উঠল। সেই ব্যক্তি আর কেউ নন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু তারপর? 'রুটিনমাফিক ট্রিগার টিপা, তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার পাখির ঝাঁক পাখা মেলে উড়ে গেল, বেহেশতের দিকে তারপর ডেডস্টপ। তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে থামলো, কিন্তু তোমার রক্ত স্রোত থামলো না। সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত, সেই লাল টকটকে রক্ত বাংলার দুর্বা ছোটার আগেই কর্ণেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালো।'-ঠিক যেন পলাশীর আম্রকাননের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আর ঘটনাটি ঘটেছে '৭৫-এর ১৫ আগস্টের কালোরাত্রিতে। ঘাতকের হিংস্র কালো থাবা কেড়ে নেয় সেই অমিততেজী ইতিহাসের মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধুর প্রাণ।

আজ সেই পনেরই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। এ শোকের মাঝে বাঙালি জাতির শুধু কান্না প্রবাহই সৃষ্টি করে না, উত্তাল দুঃখবোধের বাসও এ শোকের মাঝে আছে। চিরঞ্জীব মহা মহাত্মাজীবন স্পর্শ করার প্রত্যয়।

আগস্ট মাস মানেই বাঙালির ব্যর্থতার ইতিহাস, সিরাজের দ্বিতীয় পরাজয়, শৌর্যবীর্য হারানোর লজ্জার ইতিহাস, নিজেকে ধিক্কার দেয়ার ইতিহাস। সেই দিনের সেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এখনো জাতিকে আলোড়িত করে। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে ঘটে যাওয়া সেই কলংকিত ঘটনায় জাতি হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা যা অর্জন করেছিলাম, সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে তা সমূলে বিনষ্ট করা হল। আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের জাতীয় চার মূলনীতি, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক মুক্তির অগ্রযাত্রা, প্রগতিশীলতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা। '৭৫ পরবর্তী এই ৩৮ বছর কেটেছে ঘোর তমাশার মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর নাম মুখে উচ্চারণ ছিল নিষিদ্ধ সম্পাদীকায়'র মতো। ইতিহাসের চরম বিকৃতি ঘটিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু এবং সত্য ইতিহাসকে দূরে সরিয়া রাখা হয়। শুধু তাই নয়, আইন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়। দীর্ঘ একুশ বছর জাতি এগুতে

থাকে স্বাধীনতার জনক ছাড়া। বাংলাদেশের জন্য সংগ্রাম করার শাস্তি দেয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে এবং তা ছিল মানুষের স্মৃতিতে এবং হৃদয়ে। সেখানেই আছেন বঙ্গবন্ধু, সেখানেই থাকবেন চিরকাল-ইতিহাসের সৃষ্টিরূপে এবং স্রষ্টারূপে। একুশ বছর পর বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিল। আবারও বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে। শত ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ একটি যূথবদ্ধ শব্দ।

হারানো সে মর্যাদা বঙ্গবন্ধু ফিরে পেয়েছেন, যে আসনে তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সেই আসন থেকে যাতে আর কখনো বিচ্যুত হতে না হয় তার জন্য আমাদেরকে অতন্দ্রপ্রহরী হিসেবে কাজ করতে হবে। জীবদ্দশায় বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখতেন সেই স্বপ্ন আদর্শের বাস্তবায়নেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দেখা সোনারা বাংলা সত্যিকার অর্থেই যেদিন প্রতিষ্ঠা পাবে সেদিনেই শোধ হবে বঙ্গবন্ধুর ঋণ। এই মহান নেতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

সূত্র : দৈনিক রূপালী, ১৫/০৮/১৯৯৭

দু'হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

আবদুল লতিফ সিদ্দিকী

বাঙালিত্বকে ভূগোল-বিভাজিত একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অহঙ্কার হিসেবে উদযাপিত, প্রতিপালিত এবং প্রদর্শিত হতে দেখা গেলে যে শীর্ষপুরুষ তার সর্বোচ্চ সাংগঠনিক প্রবক্তার অভিধা পেতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বক্তব্যের সমর্থনে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য 'বন্ধবন্ধু বিগত দু'হাজার বছরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি–' খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে উদ্ধৃত হতে পারে। বাঙালিত্বের মর্যাদাকে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠার দায়ভার আর যারা গ্রহণ করেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁর স্বপ্রতিভায় প্রৌজ্জ্বল হলেও জাতিগোষ্ঠীর অবকাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্তার ভূমিকায় তারা বঙ্গবন্ধুকে অতিক্রম করতে পারেননি। ভাষা সাহিত্য দর্শন শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি যেসব অবস্থানে বাঙালি যুগপুরুষেরা তাঁদের কীর্তিফলক সংস্থাপিত করেছেন সে সবের পূর্ণ দীপ্তি স্বীকার করেও বঙ্গবন্ধুকে যে একটি পৃথক অহঙ্কারে বরণ করা যায় তার মূলে আছে এ সত্য যে, মূর্ত-বিমূর্ত উভয় শক্তির সম্মিলনে তিনিই একটি টেকসই সংস্কৃতি কাঠামো সূত্রবদ্ধ করতে পেরেছেন।

ব্যক্তি-প্রতিভার বিচ্ছুরণে সমাজের স্তরোন্নয়ন যে সম্ভব তা সর্বজন স্বীকৃত; কিন্তু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিক বিকাশ কখনও স্থায়ী কোন প্রাতিষ্ঠানিকতার জন্ম দিতে পারে না বলে সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক বৃদ্ধির বিকিরণ জাতি-সংহতি ও সমাজ-সংস্কৃতি নির্মাণ করতে পারে না। যে কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, রবীন্দ্র-নজরুলসহ অন্য কালপুরুষেরা ইতিহাসের যাত্রাকে বর্ণাঢ্য করে তুললেও তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কৃতিত্বের নিরিখে বঙ্গবন্ধুই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেতে পারেন; বর্তমানকালের জনজরিপের প্রেক্ষাপটে সেটা ইতোমধ্যে অবশ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

কোন বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবন-গৌরবের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভবপর করে তুলেছিলেন সে দিকে দৃষ্টি ফেরালে তাঁর ব্যক্তিসত্তার বিশেষত্ব টের পাওয়া যায়। জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস তিনি নির্মাণ করেন তা তাঁকে ব্যক্তিসত্তার গৌরবসীমা ভেঙে জাতিগত গোষ্ঠীসত্তার অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তি-একক হিসেবে তাঁর যে কীর্তিমূল্য তা স্ফীত হয়ে জাতীয়

অর্জনের বাটখারায় প্রতীকী মূল্যমানে মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে। যে মর্যাদার আসনে তিনি অভিষিক্ত তাঁর জন্য তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে এজন্য যে, সর্বজনীন মূল্যায়নে তিনি জাতিসত্তার সপ্রাণ পতাকা; প্রতীকার্থই যেখানে প্রধান। এ অর্থে তিনি একের ভেতর বহু, সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য।

ঔপনিবেশিক মস্তিষ্কেও জঞ্জাল হিসেবে দ্বিজাতিতত্ত্বেও ছুরিতে ভারতভূমি দ্বিভাজিত হলে মুসলিম জাতিসত্তার যে অন্তঃসারশূন্য উদ্বোধন ঘটে তা দিয়ে জনমানুষের স্বাধীনতার আসল স্পৃহাকে প্রশমিত করা সম্ভব ছিল না। সাতচল্লিশ-উত্তরকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আড়াই দশকে বঙ্গবন্ধুর এ অনুভব ক্রমাগত পোক্ত হয়েছিল যে, একপেশে ধর্মতত্ত্ব স্বাধীনতার অন্তরায়; এর জন্য চাই জাতীয় চেতনা, বাঙালিত্বের চেতনা।

ইতিহাসের কালপুরুষ যারা হতে পারেন তাঁদের সঙ্গে উত্তর-প্রজন্মে সম্পর্ক স্বভাবত আবেগ-বিচ্ছিন্ন নিরপেক্ষতায় স্থিরীকৃত। যদি জেনারেশন গ্যাপ তিন পুরুষের অধিককালে সম্প্রসারিত হয়, তাহলে একথা একটু বেশিই খাটে। বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার অনুরূপ পরিস্থিতি বাস্তবে বলবৎ না থাকায় তাঁর কীর্তি বিবেচনায় আবেগের সম্পৃক্তি মস্তিষ্কের রায়ে সেটুকু অন্ত স্বীকার্য বলে মেনে নিতে হয়। এ কারণে জাতিসত্তার বর্ণাঢ্য রূপকার হিসেবে এত বড় দুর্লভ কর্মকীর্তির যিনি সাধক তাঁর গোষ্ঠীগত গ্রাহ্যতা সহজে নির্মিত হলেও জাতিগত গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে বিতর্ক জট পাকায়। এটা দুঃখজনক হতে পারে, কিন্তু হতাশাব্যঞ্জক নয় এজন্য যে, কালের প্রহার সয়েই ইতিহাসের আলোকস্তম্ভকে তার শিখা জ্বেলে রাখতে হয়। বড়র বিতর্ক বারোয়ারির চেয়ে যে প্রাবল্য পাবে সে তো সাধারণ কথা। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে আবেগের হস্তক্ষেপ আছে এ কথা সত্য; কিন্তু মস্তিষ্কের সিদ্ধান্তের কাছে অবনত থেকে এ কথা উচ্চারণ করতে পারি, তাঁর জীবনের সার্বিক সংগঠন যেভাবে রূপ পেয়েছে তাতে বড় জীবনের বিভা ও বৈভব সর্বাংশে দীপ্যমান।

বিভাজনোত্তর চব্বিশ বছরের রজানৈতিক চক্রাবর্তে বঙ্গবন্ধু অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় পালন করে গেছেন তাঁর আদর্শনিবিষ্ট ভূমিকা। এক্ষেত্রে ধার্মিকতার যে ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতি পাকিস্তান আদর্শের নেতৃবর্গ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাতে কৃত্রিমতা যেমন অবলম্বিত হয়েছে তেমনি শোষণের বাহন হিসেবে ধর্মানুভূতিকে সর্বাগ্রে কাজ লাগানোর প্রয়াস লক্ষণীয়। ভূগোল-নিরপেক্ষ ইসলামিকতার ধুয়া তুলে দুই পাকিস্তান অথবা পূর্ব-পশ্চিম দুই বাংলার ধর্মদর্শনের অভিন্নতাকে জোর খাটিয়ে বড় করে দেখানোর সে অপপ্রয়াস বাঙালি মনের সংবেদনায় যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বাঙালির এ বিমুখ মানসিকতার বিক্ষোভে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে

জনস্রোতের গতিমুখ পর্যবেক্ষণ করে তিনি সর্বসাম্প্রদায়িক গণনেতৃত্বের হালটিকে শক্ত হাতে ধরতে পেরেছেন। মানব প্রকৃতির শুদ্ধ পাঠ রপ্ত থাকায় ইহজাগতিক রজনৈতিক সংস্কৃতির দায়বোধ তাঁর মধ্যে দানা বাঁধতে পেরেছে; মুক্ত মানব সংস্কৃতির পচারিতা তাঁকে বাঙালির মনোভঙ্গি উপলব্ধির দুয়ার খুলে দিয়েছে। মানবের অক্ষমতাকে যারা মর্যাদার চোখে দেখতে পারেনি, তাঁর সম্প্রদায়গত ভিন্নতাবোধের গলি-ঘুপচিতে মানবতাবাদের আদর্শে খেই হারিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর চলার রাস্তাটি নিজের মতো করে নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। তর্কাতিত প্রত্যয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক তরিকায় অবিচল থেকে সিদ্ধির মোহনায় মিলিত হতে পেরেছেন বৃহৎ মানবের অবিভাজিত মহাসমুদ্রে। এটা ব্যক্তি আদর্শেও এক বিশিষ্ট দিক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযুক্তি ভূগোলসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না; হিন্দুত্ব আর মুসলমানিত্ব যখন পরস্পরকে সাংঘর্ষিকভাবে মোকাবিলা করে চলেছে তখন দ্বিজাতিতত্ত্বের ঔপনিবেশিক আস্কারা ভারতভূমিতে বেপরোয়া ছুরি-চাকু চালিয়ে পূর্ববাংলাকে পশ্চিমবাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। হাজার মাইলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকে তারা ধর্মীয় সংহতি দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছে; কিন্তু জীবনপ্রণালী, সংস্কৃতিনিষ্ঠ, চিন্তাপ্রকৃতি ও ভাষাভাষিতার দৃষ্টিকোণে দুই পাকিস্তানের মধ্যে ধর্মীয় বহিরাবরণ ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যযোগ্য অভিন্নতার অস্তিত্ব ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সত্যটি উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিলেন বলে রজানৈতিক মতাদর্শ তাঁর ভুল হয়নি।

একাত্তর পরবর্তী প্রশাসন সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পালনে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হতে দেখা যায় তাতে বঙ্গবন্ধুর প্রাণগত বিশেষত্বে প্রতি অবিচারই শুধু করা হয়েছে। চির-ঔদার্যের যে ব্যক্তিমহিমা তিনি ধারণ করেন তাকে বুঝতে না পেরে রাজনীতি বলয়ের একাংশ উদারতাকে স্বেচ্ছাচারিতা ও শক্তিমত্তার অপব্যবহারগত গড্ডলিকায় গা ভাসাতে থাকে। প্রশাসনভুক্ত ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হৃদয়গত বিশালত্বকে শোষণ করে নেতৃত্বের স্বাভাবিক প্রবাহ ও মসৃণতাকে ক্ষুণ্ন করে। দ্বিতীয় বিপ্লব বলে যে কর্মসূচি তিনি বিধিবদ্ধ করেন বৃহৎকালের পরিসরে তা প্রতিপালিত হতে পারলে তার সুফল অনিবার্যভাবে জাতির জন্য ভোগ্য হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সে সময়কার জটিলতর বৈরী পারিপার্শ্বিকতায় সবকিছু সামলে উঠতে যে সময় ও সমর্থন জরুরি ছিল দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা থেকে তিনি হয়েছেন সম্পূর্ণই বঞ্চিত। পরাজিত প্রতিশক্তির জঙ্গিবাদী আক্রোশ, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, উগ্র বামপন্থা-আশ্রিত রাজনৈতিকগোষ্ঠীর সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, যুদ্ধবিধ্বস্ততার অপশক্তি বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ও প্রশাসন কাঠামোকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে

ফেলেছিল। সবশেষে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারীদের চূড়ান্ত অপঘাতে শাহাদাতের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নাদর্শিত দেশচিত্রের বাস্তবায়নের আগেই পৃথিবীর আলো-বাতাস, বর্ণগন্ধের আস্বাদ অসম্পূর্ণ রেখে অন্তর্হিত হন। কিন্তু ১৯৪৭-১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তার যে সাড়ম্বর উপস্থিতি তাই তাঁকে রাজনৈতিক ইতিহাহসের কালপুরুষে পরিণত করে।

জীবনকালের পরিসীমায় পৃথিবীর অনেক স্বর্ণপুরুষই তাঁর কর্মকীর্তি প্রকৃত স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হন; ব্যক্তিদুর্বলতা হয়ত সবার ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর থাকতে পারে, কিন্তু কর্মকীর্তিও নিরাবেগ মূল্যায়ন একদিন ইতিহাসের ধারাক্রমে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের প্রতীক্ষা শেষে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশ অনুধাবন করছে বঙ্গবন্ধুর কর্মকীর্তি আসলে কোন মহান উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিসঞ্চারী আইনী নিরপেক্ষতার ফলেই ইতোমধ্যে ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত পাঁচ খুনি। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে মৌলধারায় পরিচালিত হতে দেখেছি তাতে ব্যক্তিগতভাবে এটুকু প্রত্যয় আমি ধারণ করি যে, ইতিহাসের নিরপেক্ষ কাঠগড়ায় জাতিরাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদিন জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন কিংবা অপরাপর বিশ্বনেতৃত্বে প্রতীক-চিহ্নিত মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

লেখক : সাবেক মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গবন্ধু কেন শ্রেষ্ঠ বাঙালি

মোনায়েম সরকার

বাংলাদেশের তিনি জাতির পিতা এবং বঙ্গদেশের (বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার) সমগ্র বাঙালির মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে স্বীকৃত হয়েছেন। কারণ বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন দেশের তিনিই প্রথম রূপকার। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মধ্যযুগে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলাদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু ইলিয়াস শাহ বাঙালি ছিলেন না। সেদিক থেকে বঙ্গবন্ধু প্রথম বাঙালি যিনি স্বাধীন বাংলার প্রথম নৃপতি।

বাঙালিদের স্বাধীন ভূমি এনে দেয়ার প্রয়াস ছিল অনেক বাঙালি নেতারই এবং বাঙালিকে ভালোবেসেছিলেন অনেক জননেতাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষ বসু, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের অবদান বাঙালি সমাজে চিরস্মরণীয়। বাঙালিরাও তাঁদের আর নাম ধরে ডাকে না। বলে থাকে 'দেশবন্ধু', 'নেতাজী', 'শেরে বাংলা' নামে। তবে 'বঙ্গবন্ধু' সব খেতাবকে ছাড়িয়ে গেছেন এবং তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে স্থান লাভ করেছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। এ ভাষণের অন্য নাম 'বজ্রকণ্ঠ'। এ কণ্ঠ কাঁপিয়ে দিয়েছিল সমগ্র দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষকেও। তাই বিশ্বের বড়ো বড়ো জননেতাকেও ছাড়িয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু।

বিবিসি'র বাংলা সার্ভিসের জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এই জরিপের ফলে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত হয়েছেন। শিক্ষিত মননশীল সমাজ ভালোভাবেই জানতেন যে বঙ্গবন্ধুর স্থান বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাসে নির্ধারিত হয়ে আছে। কেউ ইচ্ছে করলেই তাঁকে ইতিহাস থেকে নির্বাসিত করতে পারবে না। মহাত্মা গান্ধীকে বাদ দিয়ে যেমন ভারতের ইতিহাস লেখা যায় না, মাও সেতুংকে বাদ দিয়ে চীনের, হো চি মিনকে বাদ দিয়ে ভিয়েতনামের ইতিহাস লেখা যায় না, জর্জ ওয়াশিংটনকে বাদ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস লেখা যায় না, তেমনি

বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা যায় না। তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীন রাষ্ট্র এনে দিয়েছেন। পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালির আবাসভূমি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বিবিসি'র জরিপটি বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা'। এই বিষয়টি সর্বোচ্চ বিবেচনায় রেখে জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ অভিমত প্রদান করেছেন। বাঙালি জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যত কাব্য, মহাকাব্য ও অন্যান্য সাহিত্য কিংবা প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গবেষণা হয়েছে, দুনিয়ার আর কোনো জননেতা সম্পর্কে হয়তো এত রচনা এখনো রচিত হয়নি। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই তিনি অনন্য অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। এগুলোর মধ্যে বাংলা একাডেমী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জীবনী গ্রন্থ (দুই খণ্ডে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি (২০০৮), রক্তমাখা বুক জুড়ে স্বদেশের ছবি (১৯৮২), ইতিহাসের আলোকে বাঙালি জাতীয়তার বিকাশ ও বঙ্গবন্ধু (১৯৯২), ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু (১৯৯৪), মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব (১৯৯৫), শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ (১৯৯৮), বাঙালি বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু (২০০০), বাংলাদেশের সমাজবিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন (২০০০), ইতিহাসের আলোকে বাঙালি জাতীয়তার বিকাশ ও বঙ্গবন্ধু (প্রথম সংস্করণ-১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০০), বাঙালির কণ্ঠ (২০০১), সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি (২০০৪), একবিংশ শতাব্দীতে মুজিবের প্রাসঙ্গিকতা (২০০৭), সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি (২০১০), বাঙালির ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ (২০১০), আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ (২০১০)।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বহু পণ্ডিত ব্যক্তির এত লেখালেখির মধ্যে সম্প্রতি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থটিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, বিবিসি জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হওয়ায় যথার্থতাই প্রমাণ করে। আজ থেকে ১৮ বছর আগে ১৪০০ সাল উদযাপন পরিষদের 'বাঙালির বাংলাদেশ' নামক সংকলন গ্রন্থ আমরা উৎসর্গ করেছিলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিবিসির জরিপ এ সত্যই প্রমাণ করেছে। বিবিসির জরিপ প্রকাশের পর বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে দেশের ভেতরে এবং বাইরে অবস্থানরত সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, কবি, সাংবাদিক বিবিসি'র জরিপের ফলকে স্বাগত জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন লেখনীর মাধ্যমে।

সম্প্রতি আমার ও ড. মোহাম্মদ হান্নানের প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ বাঙালি' গ্রন্থটি প্রকাশনা জগতে স্থান করে নেবে এই জন্য যে, এই সংকলন ও সম্পাদনায় খানিকটা ব্যতিক্রম আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর বিশিষ্টতা, সুশীল সমাজের মূল্যায়ন, তৃতীয় অধ্যায়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মূল্যায়ন, চতুর্থ অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোরকে ভিত্তি করে নানা রকম রচনা, পঞ্চম অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড পূর্বাপর ঘটনাবলী, ষষ্ঠ অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী নানা প্রতিবাদের দালিলিক বিবরণ, সপ্তম অধ্যায়ে বিভিন্ন মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি-প্রশস্তি এবং অষ্টম অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ভাষণগুলো মুদ্রিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর উপর হাজারো গ্রন্থের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও শ্রেষ্ঠ বাঙালি গ্রন্থ দুটি এজন্য ব্যতিক্রম হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে যখন বঙ্গবন্ধুর ওপর আরো গবেষণা হবে তখন বহু গ্রন্থের মধ্যে এ গ্রন্থ দুটি নানামুখী মূল্যায়ন ও তথ্যের আকর হিসেবে দেখা দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু

হাসানুল হক ইনু

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, বাঙালি জাতি ও এ ভূ-খ-ের অন্যান্য জনগোষ্ঠী ইতিহাসের সবচাইতে মহত্তম ও বৃহত্তম কর্মযজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠতম অর্জন। মুক্তিযুদ্ধ একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সুনির্দিষ্ট অতীত ও ইতিহাস, রাজনৈতিক আদর্শ-দর্শক-লক্ষ্য, নেতৃত্ব, শত্রু-মিত্র, পক্ষ-বিপক্ষ ছিল।

এই ভূ-খণ্ডের জনগণের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার হাজার বছরের আকুতি স্বপ্ন ও সংগ্রাম ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ লাভ করে। ১৯৫৪২ সারের মহান বাংলা ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক উন্মেষ, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙারির রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান, ১৯৬২ সালের সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও গণতন্ত্রেও আন্দোলন, ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালে ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্র সমাজের আন্দোলন, ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তি ও বঙ্গবন্ধুর উত্তান ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে গণরায় প্রদানের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের জন্য পরিপক্ক হয়েছে। তিলতিল করে গড়ে ওঠা এ দীর্ঘ সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ ও নির্দেশে ঐতিহাসিক নজিরবিহীন অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র জাতির অবিসংবাদিত নেতা ও মহানায়কে পরিণত হননি সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রস্তুত করেন। এ দীর্ঘ সংগ্রামে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ন্যাপের উভয় গ্রুপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটিচ জনযুদ্ধ। সমগ্র জনগণের যুদ্ধ স্বল্পসংখ্যক বিশ্বাসঘাতকে ছাড়া তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি জনগণই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীর বিদ্রোহী বাঙালি সদস্য থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-তরুণ-যুবক-নারী-কৃষক-শ্রমিক-শিক্ষক-সাংস্কৃতিক কর্মী-বৃদ্ধিজীবি-চিকিৎসক-নার্স-প্রকৌশলী-সরকারি চাকরিজীবিসহ বিভিন্ন শ্রেনি পেশার নাম জানা না জানা লক্ষ লক্ষ মানুষ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। ৩০ লক্ষ মানুষের জীবন, কয়েক লক্ষ নারীর সম্ভ্রম, এক সাগর রক্ত সমগ্র জাতির সীমাহীন ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু, কারিগর মুক্তিযোদ্ধারা আর মালিক জনগণ।

একটি স্বাধীন এবং শোষণহীন, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট স্বপ্ন ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। জাতিগত নিপীড়নকারী পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে যে অন্যায্যতা ছিল তার মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক ন্যায্যতা তৈরি হয়েছিল। ইতিহাসের এ ন্যায্যতাকে অস্বীকার করে জামাতে ইসলামসহ যারা পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার নামে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তারা ইতিহাসের বিপক্ষে অন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দালাল রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী সমগ্র জাতির ওপর ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা, গণধর্ষণ, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত করেছে। তাদের এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মুক্তিযুদ্ধের সুস্পষ্ট শত্রু-মিত্র ছিল। সমগ্র বিশ্বে মানবতাবাদী শান্তিকামী গণতান্ত্রিক জনগণ মুক্তিযুদ্দের প্রতি সমর্থন যুগিয়েছিলেন। বিশেষ কর ভারত, তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট দেশসমূহ, নেপাল, ইরাক সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী ও তার সরকার তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশাল রাজনৈতিক কূটনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নি:শর্ত রাজনৈতিক সামরিক আর্থিক মানবিক বিশাল সমর্থন প্রদান করেছিলেন। ভারত দেড় কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ, অস্ত্র-শস্ত্র সামরিক সরঞ্জাম প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদভূমি হিসাবে ভারতের মাটি ব্যবহার করা হবে সহ নানাভাবে সামরিক সহযোগিতা প্রদান করেছি। ভারতের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দল, মহল, ব্যক্তি, সর্বস্তরের জনগণের মানবিক সাহায্য ও

অপরিসীম ত্যাগ কষ্ট স্বীকারের ঘটনা অবিস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ-ভারতের যৌথবাহিনীর অংশ হিসাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় চার হাজার জওয়ান শহীদ এবং দশ হাজার জওয়ান আহত হন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান ও পাকিস্তানের পক্ষে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌ বহর প্রেরণ সহ সামরিক বল প্রয়োগের হুমকির বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভোট প্রয়োগের ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য তয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরাই একমাত্র সৌভাগ্যবান জাতি যে জাতি ভাষাভিত্তিক আধুনিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা পৃথিবীর দু'টি সৌভাগ্যবান জাতির একটি যাদের লিখিত স্বীধনতার ঘোষণা আছে। যে ঘোষণার বলে আমরা স্বাধীনতার জন্য সরকার গঠন ঘোষণার ভিত্তিতে আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালন করছি। এরপরও স্বাধীনতার ঘোষনাসহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক শুধু দু:খনকই নয়, আত্মঘাতী। এ বিতর্ক কেবল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদেরই শক্তি যোগায়।

লেখক: সভাপতি জাসদ।

বাঙালির স্মৃতিতে অমর বঙ্গবন্ধু

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

১৯৭৫-এর পনেরই আগস্টের মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কোনো জাতর জাবনে বেশি ঘটে না। এই হত্যাকাণ্ড বিশ্বাসঘাতকতার ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার একটি চরম দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিই ছিলেন না, ছিলেন জাতির জনক, ছিলেন বাংলাদেশের স্থপতি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল প্রবাসী সরকার। তিনি সেই সরকারের ঘোষিত প্রেসিডেন্ট, যদিও তিনি প্রবলভাবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে শেষদিন পর্যন্ত। তিনি উপস্থিত ছিলেন সকল বাঙালির চেতনায় এবং অবশ্যই প্রবাসী সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের প্রেরণা হয়ে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল তাঁরই নামে। তাঁর অবর্তমানে রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ঘাতকেরা শুধু সেদিনের রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করেনি, তাঁর পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্যকে হত্যা করে। নারী, শিশু কেউ অব্যাহতি পায়নি সেই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ থেকে। বিশ্বের ইতিহাসে এই নির্মম সহিংসতার তুলনা মেলা ভার। এই সহিংসতা ও নির্মমতা বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর নিকটাত্মীয় আরো দুটি পরিবারে। আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল যুগপৎ তিনটি বাড়িতে। পৃথক অবস্থানে বঙ্গবন্ধুর ভাগিনেয় শেখ মনির বাসগৃহ ও ভগ্নিপতি সেরনিয়াবাতের বাসগৃহ আক্রান্ত হয়। তিনটি পরিবারের সন্তানসহ ঐ আক্রমণে সর্বমোট ৩৭ জন নিহত হন।

বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ বিমানযোগে তাঁর পৈত্রিক বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যায় ঘাতকের লোকেরা, যারা ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় চরম অবজ্ঞায়। অত্যন্ত দায়সারাভাবে তাঁর দাফনে যেটুকু আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করা গিয়েছিল, তা সম্ভব হয়েছিল কতিপয় গ্রামবাসীর চাহিদা মোতাবেক। অন্যদের বেলায় তা-ও সম্ভব হয়নি। বনানী গোরস্থানে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই সমাধিস্থ হন বঙ্গবন্ধু পরিবারের ও দুই আত্মীয় পরিবারের সদস্যরা।

এই নির্মম ঘটনা ছিল একেবারেই অচিন্তিত। বঙ্গবন্ধু কখনো তাঁর সম্ভাব্য হত্যা বিষয়ে কোনো হুঁশিয়ারি গ্রাহ্য করেননি। তিনি গণভবনের নিরাপত্তায়

থাকার প্রয়োজন অনুভব করেননি। ধানমণ্ডির স্বগৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে যা ছিল তা একজন রাষ্ট্রপতির উপযোগী নয়। তিনি নিশ্চয়ই সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা করবে না। তিনি যাদের প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন, তারাও তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। এমন বিশ্বাস মহৎ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। প্রাণ দিয়ে তিনি এই বিশ্বাসের মূল্য দিয়ে গেলেন, যেমন দিয়ে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁকেও তাঁর সরকারি বাসভবনের শিখ দেহরক্ষীদের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, তিনি তা গ্রাহ্য করেননি। সামনে দাঁড়ানো সশস্ত্র ঘাতকদের দেখেও বঙ্গবন্ধু বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেননি, তারা খুন করতে এসেছে। না হলে তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত না; 'তোরা কি চাস্'-এই স্বভাবসুলভ উক্তি।

এই প্রশ্নের উত্তর তারা দিয়েছিল বন্দুকের ট্রিগার টিপে। গুলিতে গুলিতে তাঁর দেহ ঝাঁঝড়া করে দিয়েছিল। সেখানে থামেনি। এরপর তাদের লক্ষ্য পরিবারের অন্য সকল সদস্য। নিষ্পাপ বালক বঙ্গবন্ধুর ছোট সন্তান রাসেলও রক্ষা পেল না। এই জল্লাদদের হাত থেকে।

এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের হোতারা কারা এবং তারা কি চেয়েছিল, এ নিয়ে আজ আর বড়ো বেশী বিতর্ক বা অস্পষ্টতা নেই। তারা যদিও আপাত দৃষ্টিতে ব্যক্তি শেখ মুজিবকে হত্যা করেছে, কিন্তু তাদের হত্যার পরিধি বিচার করলে এবং সেই পরিধির বিস্তার নভেম্বরের চার নেতার হত্যার কথা বিবেচনা করলে, সন্দেহ থাকে না তারা ব্যক্তিকে হত্যা করেনি, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আত্মাকে হত্যা করেছে। হত্যার দায় তারা কখনো অস্বীকার করেনি, বরং গর্বের সাথে স্বীকার করেছে এবং সদর্পে বলেছে, 'আমি খুনি, পারলে আমার বিচার করুক। ঘাতকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তারা চিরদিন থাকবে বিচারের ঊর্ধ্বে। এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন ছিল না। হত্যার পরপরই যারা ক্ষমতায় এল, তারা আইন পাস করে তাদের বিচারের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ইনডেমনিটি অ্যাক্ট ছিল তাদের রক্ষাকবচ। এছাড়াও ছিল হত্যাপরবর্তী সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা। দেশে নয়, বিদেশে সরকার তাদের দেখভাল করেছে, বিদেশের দূতাবাসে চাকরি দিয়েছে, শুধু আইনের নিরাপত্তা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি, তাদের পুরস্কৃত করেছে। একইসঙ্গে, তারা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে বাতিল করে নতুন বাংলাদেশ গঠনে মনোযাগী হয়েছে। এই নতুন বাংলাদেশ হবে বাংলাদেশের পাকিস্তানী সংস্করণ। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা শুরুতেই পরিত্যাজ্য। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্মের যে মর্যাদার জায়গা ছিল পাকিস্তানে, সেটা সাড়ম্বরে ফিরিয়ে আনা হলো। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক

দল, যা নিষিদ্ধ হয়েছিল বাংলাদেশের সংবিধানে, তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম করা হলো। সংবিধানের সংশোধন যা করা হলো, সবগুলোর উদ্দেশ্য একঃ সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরতো মুছে দিয়ে সংবিধানকে নতুন বাংলাদেশের উপযোগী করে পুনঃনির্মাণ। এতেও সন্তুষ্ট হলেন না, জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরি, তিনি ৮ম সংশোধনীর মারফত ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করলেন। সেক্যুলারিজমের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিলেন তিনি।

নতুন বাংলাদেশের সকল সরকার '৭৫-এর ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতা রা করেছে। এই হত্যাকে তারা অপরাধ বিবেচনা করেনি। এই হত্যার বিচারের কোনো উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেনি। সে উদ্যোগ নিতে হয়েছে '৯৬-এর নির্বাচনে জয়ী শেখ হাসিনার সরকারকে। সরকারের প্রথম পাঁচ বছরের মেয়াদে পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে, দেশের সাধারণ আইনে, তবে বিচারের পরিণতি দেখে যেতে পারেনি সরকার। পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারেনি, ক্ষমতায় এসেছে যে জোট সরকার, সে সরকারের অংশীদার ছিল জামায়াতে ইসলামি। সুতরাং প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আরম্ভ করা কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। ২০০৮-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও মহাজোট বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসবার পর, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার তার পরিণতি লাভ করে হত্যার ৩৪ বছর পর ২০০৯ সালে। হত্যা অপরাধে যারা অপরাধী হিসেবে দণ্ডিত হয় তাদের প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়, অংশত। পলাতক অপরাধীরা আজ পর্যন্ত আইনের নাগালের বাইরে রয়ে গিয়েছে।

এক দিক দিয়ে, '৭৫ পরবর্তী হতাশা ও অপেক্ষার দীর্ঘরাত্রির অবসান হয়েছে বর্তমান সরকারের অধীনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রায় চল্লিশ বছরের ইতিহাসে এ এক বড় প্রাপ্তি। কে ক্ষমতায় এলো, তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন স্থায়ী হয়েছিল বিশ বছরের অধিক। এর অবধারিত ফল হয়েছিল, বিচার বিভাগের পঙ্গুত্ব। ঘৃণ্যতম অপরাধের বিচার করা সম্ভব হয়নি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিচার ব্যবস্থায়। আজ সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন হচ্ছে সেই বিচার বিভাগকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার লক্ষণসমূহ।

২০০৮-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের বিজয়, জনগণের একটি দাবির বিজয় বলে গণ্য হবে। সে দাবি, ১৯৭২-এর সংবিধানের পুনরুজ্জীবন ও একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। দুটি দাবি পূরণের লক্ষ্যেই অগ্রসর হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। লক্ষ্য পূরণের পথে বাধা আসছে শুধু বাহির থেকে নয়, ভিতর থেকেও। ভুলে গেলে চলবে

না, '৭২-এর সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অখণ্ড ধারণা। এক্ষেত্রে কোনো আপোশের অবকাশ নেই।

পঁচাত্তরের আগস্টে ও নভেম্বরে, যা ঘটেছিল, তা বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে কক্ষচ্যুত করেছিল। সেই কক্ষচ্যুতি নিদারুণ ক্ষতচিহ্ন রেখে গিয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে তার বিস্তার ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রীকে প্রায় প্রত্যহ হুঁশিয়ার করতে হচ্ছে তাঁর নিকটজনকে, যেন কোনো দুর্নীতির পথে তারা পা না বাড়ান। দুর্নীতির জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা যেমন দেখে যায়, সে জালের আলিঙ্গন যে কত গভীর, তাও আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। '৭৫-এর আগস্টের মারাত্মক আঘাতের পর কেন দেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি, কেন আমাদের এত দীর্ঘকাল দুঃশাসন ও অপশাসনের পরাজয় ও অপমান স্বীকার করতে হলো, এর কোনো সদুত্তর আমরা এখনো পাইনি। আমাদের রাজনৈতিক চেতনা কি এখনো দৃঢ়মূল নয়? আমাদের রাজনৈতিক সংগঠন কি এখনো দুর্বল? কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল দেখে কে বলবে যে, বাংলাদেশের ভোটার ভোট প্রদানে বড় রকমের ভুল করেছে?

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের এই জনগণের ওপরই আস্থা রেখেছিলেন। জনগণই ছিল তাঁর শক্তির উৎসব। তাঁর মধ্যেই বাংলা জনগণ তাদের অবিসংবাদিত নেতার সন্ধান পেয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চেয়েছিল, বাংলার মানুষ তাঁকে ভুলে যাক। বাংলার মানুষ তাঁকে ভোলেনি। বাংলার মানুষের শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত হয়ে আছেন তিনি, তাদের ভালোবাসায় সিক্ত আছেন আজও। জাতির জনক, ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে যারা হত্যা করেছিল, সেই কলঙ্কের অপলোচন হয়েছে তাদের বিচারের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর আসন স্থায়ী হয়ে আছে বাঙালির হৃদয়ে।

বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান
শেখ মুজিবুর রহমান

সরদার ফজলুল করিম

আজ ছিল ১ বৈশাখ, বুধবার। আমি রমনার বটমূলে যেতে পারিনি। কিন্তু আজ ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য ছিল। তার একটা আভাস পেলাম সৌরভ-রতন তনু, ওরা যখন ওদের প্রেসক্লাবে আয়োজিত আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিতে আমাকে একটি ট্যাক্সিতে করে নিয়ে যেতে গিয়ে জ্যামে পড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে আধঘণ্টার রাস্তা এক ঘন্টাতেও পেরুতে পারছিলাম না, সেই ঘটনা দেখে। রতন তনু প্রতি মুহূর্তে ওর মোবাইল থেকে প্রেসক্লাবে রাইটার্স ফোরামের প্রধান রাহাত খানকে কেবল বলছিল: এই কাওরান বাজার ছাড়িয়ে রেললাইন পেরুচ্ছি। এই তো প্রেসক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছেছি। আমি খোঁড়া মানুষ বলে সকালে রাস্তায় বেরুতে পারিনি। তাই এই লোকারণ্যের দৃশ্য আমার জন্য দস্তুরমতো চমকই ছিল।
কিন্তু আসল চমক আমার জন্য অপেক্ষা করছিল রাত সাড়ে ১০ টার বিবিসির সম্প্রচার।

'৭১ সালের যুদ্ধের সময়ে, নিজে গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত, একদিনের জন্যও বোধ হয় বিবিসি শোনা বন্ধ করিনি। কেবল আমি নই আমরা সবাই। আমরা বিবিসির তিন অক্ষর ভেঙে পুরো তৈরি করেছিলাম: 'বাংলাদেশ ব্রড কাস্টিং করপোরেশন' ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন নয়।

আজো রাত সাড়ে ১০ টার সম্প্রচার আমার মনে '৭১-এর সেই স্মৃতি ফিরিয়ে এনে দুর্দান্ত এক চমকের সৃষ্টি করলো। আজকের বিবিসির সম্প্রচারে সংগঠক হিসেবে কে কে ছিলেন তাঁদের নাম আমি মনে রাখতে পারিনি। কিন্তু 'ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে' এরকম একটা অকল্পনীয় জরিপ হাতে নিয়ে তারা যে কেবল আমাদের বিস্মিত করেছিলেন, তাই নয়। তাঁরা নাটকীয়তা শুরু কলেছিলেন মহাশূন্যে যাওয়ার কাউন্ট ডাউন পদ্ধতি গ্রহণ করে, ২০ থেকে শুরু করে, ২০তম অমুক, ১৯তম অমুক, তারপর আঠারতম অমুক। শেষের দিকে গতকাল ২য় স্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকেও ঘোষণা করলেন অমুক বলে।

এবার বাকি রইল ১ নং কে? এবং এভাবে এমন নিশ্ছিদ্র অনুমানের আবহাওয়া তাঁর সৃষ্টি করেছিলেন যে, আজ সকালেও আমি কল্পনা করতে পারিনি। সেই বাকি ১নং সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে?

এটা জানার জন্য সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বিবিসি ধরতে না পারলাম তো অপেক্ষা করলাম সাড়ে ১০টার জন্য।

এবং সাড়ে দশটাতে 'বিবিসি' তথ্য ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন পৃথিবীকে চমকে দিলো যে ঘোষণাটি দিয়ে তার ভাষা ছিল: আমাদের জরিপের শ্রোতারা বলেছেন যে, বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কেন? কোন্ শ্রোতার কি কারণ, তার জন্য বিবিসি সংগ্রহ করেছিল: অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইতিহাসবিদ সৈয়দ অনোয়ার হোসেন এবং রাজনীতিবিদ এবং প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেনকে।

আমি আর দেরি না করে আমার মিনি ক্যাসেট রেকর্ডারটি চালু করে এই নাটকটির সবটাই রেকর্ড করে রাখলাম: বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে? তার দ্ব্যর্থহীন জবাব: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের এ দল, ও দল, সে দলের পত্রিকার হেডলাইন নয়। পৃথিবীব্যাপী পরিচিত ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা: অন্য কারো সঙ্গে যুগ্মভাবেও নয়, একেবারে এককভাবে: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এমন অনুমান হয়তো কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু বিবিসির জরিপের ফল অনুমানের মধ্যে রেখে আমরা শান্ত থাকতে পারছিলাম না, যতক্ষণ না সন্ধ্যা সাড়ে সাত এবং রাত সাড়ে দশটায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণসহ বিবিসি ঘোষণা করলো ২০তম থেকে কাউন্ট ডাউন শুরু করে জরিপকে ১নং-এ এসে থামতে হয়েছে: বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হচ্ছেন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আমার আজ রাতের এই লিপি যখন একটার সময়ে বন্ধ না করে উপায় নেই। কাল সকালে খবরের কাগজের, এ কাগজ, সে কাগজের হেডলাইনের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপার জন্য, নির্ঘুমে হলেও আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আমার মনে হয় আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল জলিল এমন একটি চমকদানেরই স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু তিনিও কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, বর্তমান মুহূর্তের নৈরাজ্যিক বাংলাদেশে বিবিসির জরিপের শেষ ফলটিতে ঘোষিত হবে বাংলাদেশের সর্বকালের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমি মনে করি এই ঘোষণার আতঙ্কেই খুনির দল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেষ রাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা

করেছিল আর সেই হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী হত্যাকারীদের পোষ্য সরকার সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করে দিয়ে আজো সেই বিচারের খেলা চালিয়ে যাচ্ছে: খুনিদের দায়মুক্তির তথাকথিত আইন করে তো বটেই। গণআন্দোলনে ইনডেমনিটি আইন বাতিল করার পর আজো।

আমি আজ জলিল সাহেবের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবো: বর্তমান সরকার পদত্যাগ যদি নাও করে তবু গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে অবিলম্বে সৎ, স্বচ্ছ মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে বাঙালি জাতির 'অদ্যকার অরডার অফ দি ডে'।

বিবিসির জরিপ সহজ সত্যটাই পুনর্ব্যক্ত করেছে

শাহ এএমএস কিবরিয়া

ঐহিত্যবাহী বিবিসির বাঙালি শ্রোতাদের জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নির্বাচিত করা হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই জরিপে অংশ নিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক মানের একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের এই জরিপের মাধ্যমে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে– যা কোটি কোটি বাঙালির মনের কথা। অস্বীকার করার উপায় নেই, ইতিহাসকে বিকৃত করে বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক অবদানকে খাটো ও তার ভাবমূর্তিকে মলিন করার জন্য স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র দীর্ঘকাল যাবৎ সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এরা বর্তমান সরকারের অভ্যন্তরে নীতিনির্ধারক হিসেবে স্থান করে নিয়েছে এবং আরো পরিকল্পিতভাবে তাদের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী যারা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার ইত্যাদি এলাকায় এবং ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করছ, তাদের সবার মতামত জরিপ করেই বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক স্থান নির্ধারিত হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার চক্র এই জরিপেও তাদের অশুভ তৎপরতা চালিয়েছে। ঘাতক গোলাম আজমকে তারা শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের ২০ জনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি, তবে মনে হয় তারা খুবই সচেষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা সফল হয়নি। ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য স্রোত সকল জঞ্জাল ও আবর্জনা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে তার বরপুত্রদের বুকে ধারণ করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সম্মান তাই স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে চিরকাল বিরাজ করবেন।

বিবিসির জরিপে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। আমি ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদে দেয়া বাজেট বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে আমাদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে অভিহিত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেন করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে ১৯৯৬ সালের ২৮ জুলাইয়ে দেয়া আমার বাজেট বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

"আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য ও অমর অবদানের কথা। তার নির্ভীক নেতৃত্ব: অতুলনীয় দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শ চিরকাল এদেশের মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।"

"বস্তুত বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নবনির্মাণ, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদ, বাঙালির নিজস্ব জাতি-রাষ্ট্র এবং আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিলো অদ্বিতীয় ও সর্বব্যাপ্ত। বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা বুঝতে পারেনি যে তারা বাঙালি হৃদয়ের কোমলতম স্থানে কঠোরতম আঘাত করেছে; বুঝতে পারেনি তাদের অপরাধের জঘন্যতা। নৃশংস ঘাতকরা জানতো না যে, তাদের শাণিত অস্ত্র বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠকে কোনোদিনই স্তব্ধ করতে পারবে না; তার বজ্রকণ্ঠ চিরকাল বাংলার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হবে, বাঙালির হৃদয়ে স্পন্দিত হবে। তাই ইতিহাস বিকৃতকারীদের দু'দশকব্যাপী পরিকল্পিত অপচেষ্টা সত্ত্বেও বাঙালি জাতির রাজনৈতি আদর্শ, অর্থনৈতিক মুক্তি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তার ঋদ্ধি– প্রতিটি ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন আজ আমাদের দিকনির্দেশনা দিচ্ছে ও প্রেরণা জোগাচ্ছে। চিরদিনই তিনি থাকবেন বাঙালির জাতির সকল কীর্তির ও প্রেরণার মর্মস্থলে।"

১৯৯৬ সালে আমি যে মূল্যায়ন করেছিলাম ২০০৪ সালে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, সেই একই মূল্যায়ন করেছে। এতে আমি অবশ্যই গৌরববোধ করছি। বাঙালি তার মনের মণিকোঠায় বঙ্গবন্ধুকে কতো ভালোবাসা ও যত্নের সঙ্গে ধারণ করছে, বিবিসির জরিপ তারই আরেকটা প্রমাণ। ইতিহাস বিকৃতিকারীদের শত অপচেষ্টা সত্ত্বেও বাঙালিরা কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পবিত্র স্মৃতিকে এমন গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত করে রেখেছে, তার কারণ নির্ধারণ করা বেশ দুরূহ একটি কাজ। কারণ একটি নয়, কারণ বহু। কর্মে, চিন্তা-চেতনায়, আবেগ ও অনুভূতিতে এবং জীবনাচরণে তিনি ছিলেন আবহমান বাংলার প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। মালয়েশিয়ায় যাদের ভূমিপুত্র বলা হয়– বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শুধু ভূমিপুত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলার অগণিত কৃষক-শ্রমিক ও গ্রামেগঞ্জের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

বঙ্গবন্ধুকে আমরা বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বলে বর্ণনা করি। কোনো এবং কিসের ভিত্তিতে? তিনি আওয়ামী লীগের প্রধান ছিলেন বা অত্যন্ত

জনপ্রিয় ছিলেন বলে? তা তিনি অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু তার বিশেষ মর্যাদার আরেকটি কারণ ছিলো। তিনি ছিলেন এদেশের নির্বাচিত নেতা। বিদেশিরা বিষয়টা বেশ ভালো বোঝে। একটি নিরপেক্ষ ও সর্বজনস্বীকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর ওপর তাদের আস্থা ন্যস্ত করেছিলো। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আসনটি ছিলো সুরক্ষিত। তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও কখনো তার এই সুউচ্চ আসন ও মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি।

গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। আমাদের সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'প্রজাতন্ত্রে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।' এখানে কোন অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থতা নেই। কারণ গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ছিলো বঙ্গবন্ধুর রক্তে। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ১৯৫৫ সালে যখন তিনি তার দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেন, তখন এই পদক্ষেপই ছিলো তার রাষ্ট্রীয় উচ্চাশার একটি পূর্বাভাস। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির ইতিহাসে নয়, বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসেও নন্দিত হবেন। ধর্মের নামে স্বার্থান্বেষীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেভাবে রক্তের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে, তা বাংলাদেশে যাতে কোনোদিন না হয় সেই লক্ষ্যেই তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সংবিধানের সুস্পষ্ট বিধান সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখনো সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করছে না। বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিলো বঙ্গবন্ধুর সযত্নে লালিত স্বপ্ন। তিনি বলেছিলেন,

> 'আমার দেশের মানুষ দুঃখী, না খেয়ে কষ্ট পায়, গায়ে কাপড় নাই। শিক্ষার আলো তারা পায় না। রাতে একটা হারিকেনও জ্বালাতে পারে না। নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি এ দেশের ভাবী নাগরিকদের জীবনকে কন্টকমুক্ত করে যেতে পারি, তাহলে আমার জীবন ধন্য হবে।'

তিনি বলেছিলেন,

'রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে।'

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্বাসিত করার পর তিনি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা করছিলেন। দুঃখের বিষয়, কুচক্রীরা ঠিক তখনই তাকে

হত্যা করে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো। দেশকে দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের আশা তার পূরণ হয়নি। কিন্তু তিনি যা করতে পেরেছেন, বাঙালি জাতির ইতিহাসে তার তুলনা নেই। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত বাঙালিদের একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। যতোদিন এই রাষ্ট্র বিশ্ব মানচিত্রের অঙ্গ হিসেবে সগর্বে মাথা উঁচু করে থাকবে, ততোদিন শেখ মুজিবের নাম বেঁচে থাকবে। বস্তুত স্বাধীন বাংলাদেশই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সর্বোত্তম বিজয় স্তম্ভ।

বিবিসি থেকে বলা হয়েছে, এই জরিপটি করা হয়েছিলো তাদের নিজেদের প্রয়োজনের নিরিখে। তারা বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতাদের সম্পৃক্ত করে তাদের প্রোগ্রামের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফল প্রকাশ শুরু হওয়ার পর থেকে শুধু শ্রোতাদের মধ্যে নয়, বাংলাদেশের সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যেও প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সংবাদপত্র পাঠক যারা জরিপে অংশ নেননি, তারাও বিবিসির এই উদ্যোগের ফল জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। শেষ পর্যায়ে যখন বাঙালির প্রাণপ্রিয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, তখন সব সচেতন বাঙালির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালি কে হবেন, সে বিষয়ে শুরু হয় জল্পনা-কল্পনা ও অধীর অপেক্ষা। প্রায় সবাই তখন মনে করেছে, যে বঙ্গবন্ধু ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিশ্চয়ই প্রথম ও দ্বিতীয় হবেন। কিন্তু কে প্রথম এবং কে দ্বিতীয় তা নিয়েই সর্বত্র ছিলো তুমূল আলোচনা ও বিতর্ক। ততোদিনে জরিপটি সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে একটা সাড়া জাগিয়ে পেলেছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বিবিসির উদ্যোগ খুবই সফল ও কার্যকর হয়েছে। তাদের শ্রোতার সংখ্যাও হয়তো বেড়েছে। তারা শ্রোতাদের মধ্যে আরো জনপ্রিয় হয়েছে।

বিবিসির জরিপে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে যে ২০ জনের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের সবার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জীবনে, তাদের শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করছেন। শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বাঙালিদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে। তিনি নিশ্চয়ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিদের পুরোভাগে রয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর পরই তার স্থান নির্ধারণ করে বিবিসির শ্রোতারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে বাঙালির শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবেই গণ্য করে। শেরেবাংলা ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানীকে এদশের মানুষ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। সমাজ সংস্কারক হিসেবে বেগম রোকেয়া ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিও বাঙালিরা

শ্রদ্ধার সঙ্গে ধারণ করে আছে। চিত্তরঞ্জন দাস কেনো ২০ জনের তালিকায় স্থান পেলেন না, এ নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই তালিকার সবাই সত্যিকার অর্থে বাঙালি কিনা। যিনি নিজেকে বাংলাদেশি মনে করতেন, যিনি কার্যত বাঙালিত্ব বর্জন করে নিজের একটি সাম্প্রদায়িক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাকেও তো এ তালিকায় ঠাঁই দেয়া হয়েছে।

এ ধরনের বিতর্ক হতেই পারে। কারণ সবার মূল্যায়ন সমান হতে পারে না। কবি-সাহিত্যিকদের অবদান সমাজে গভীর রেখাপাত করে, কিন্তু এক্ষেত্রে দু-চারজনকে বাছাই করা বড় শক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও কথাসাহিত্যিক ছিলেন; কিন্তু সার্বিক বিচারেতাদের স্থান কোথায়– তা স্থির করা সহজ নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই তালিকায় না থাকায় কেউ কেউ ক্ষুণ্ন হয়েছেন। তবে বিবিসি তালিকা প্রস্তুত করেনি, করেছেন বিবিসির শ্রোতারা। শ্রোতাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সমন্বয় বা যোগাযোগ ছিলো না। এখানেই এই জরিপের মূল্য, গুরুত্ব ও সার্থকতা।

যদিও চ্যানেল আইর দর্শকরা বিস্মিত হয়ে দেখেছেন বিবিসির সাবির মুস্তাফার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার সময় উপস্থাপক সাপ্তাহিক হলিডের সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খান বার বার ইঙ্গিত করছিলেন যে, বিবিসি যেনো কোন গোপন প্রক্রিয়ায় এই তালিকা পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে তৈরি করেছিলো। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক হয়েও তিনি কেন এ ধরনের বক্তব্য রাখলেন তা হয়তো বোঝা শক্ত নয়। বহুদিন বিদেশে থাকার ফলে এ বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানি না, তবে শোনা যায়, তার মুজিব-বিদ্বেষ নাকি ঢাকার সাংবাদিক মহলে সুবিদিত। চ্যানেল আই একজন অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপস্থাপকের দায়িত্ব দিলে অনুষ্ঠানটি আরো উপভোগ্য হতো। সাবির মুস্তাফা অবশ্য চমৎকারভাবে উপস্থাপকের কতিপয় বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিবাদ মিছিল টিভিতে দেখে আমি ব্যথিত হয়েছি। আমার বিশ্বাস, আরো বহু দর্শক এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখে দেশের তরুণ সমাজের একাংশের অধোগতিতে ব্যথিত হয়েছেন। দলীয় বিদ্বেষ যে সমাজের একটি অংশকে অন্ধ করে ফেলেছে এবং তারা যে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে প্রতিটি বিষয়কে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করছে, তাতে হতাশ না হয়ে পারা যায় না। তারা হয়তো জানে না, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার নিজের লেখা একটি নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু বলে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার উল্লেখ করেছেন। ওই নিবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখেছিলেন: "১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির জনক শেখ

মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন–' এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তার ১৮ দিন পর ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। দেশব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রাম তাই শুরু হয়েছিলো ২৫ মার্চ রাত থেকে।" ছাত্রদল তাদের প্রয়াত নেতার এমন স্পষ্ট বক্তব্য কীভাবে অস্বীকার করে বা বেগম খালেদা জিয়া কেন তার স্বামীর লিখিত নিবন্ধের তথ্য অস্বীকার করে দেশে একটা অবাঞ্ছিত বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন, তা অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়। এসব অদূরদর্শী ব্যক্তির বোঝা উচিত যে, ইতিহাস তার অমোঘ গতিতে সামনের দিকে ধাবিত হয়। ইতিহাস বড়ই নির্মম। শ্লোগান দিয়ে বা জন্মদিনের কেক কেটে ইতিহাসের গতিকে রুদ্ধ করা যায় না। বিবিসির বিশ্বব্যাপী জরিপ এই সহজ সত্যটাই আবার পুর্নব্যক্ত করেছে।

বঙ্গবন্ধুর সাহস, দূরদর্শিতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও উদারতা ইত্যাদি বিষয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। আরো নিশ্চয়ই হবে। বাংলার বিবেক নামে পরিচিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ আবুল ফজল তার দিনলিপিতে বঙ্গবন্ধুর হাসি সম্পর্কে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করে আজকের লেখাটি শেষ করতে চাই। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আবুল ফজল তার দিনলিপিতে লিখেছিলেন: "তাঁর সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে প্রাণের একটা অদ্ভুত উত্তাপ অনুভব না করে পারা যেতো না। মুখের হাসিটি ছিলো তাঁর অপূর্ব আর সর্বজয়ী।... এমন হাসি আমি অন্য কোন বাঙালির মুখে দেখিনি, এমন হাসি অন্য কোন বাঙালি হাসতে পারবে বলেও মনে হয় না। অন্তত আমি পারবো না।" বিবিসির জরিপ প্রমাণ করেছে– বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের উত্তাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোটি কোটি বাঙালির হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলো।

খোকা থেকে জাতির পিতা

মফিদা আকবর

বাঙালি। বাংলা। বাংলাদেশ এবং শেখ মুজিব। শব্দগুলো একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতি হিসেবে বাঙালি। মায়ের ভাষা বাংলা। সর্বোপরি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। উপরোক্ত বিষয়গুলোর যে কোনো বিষয়ে লিখতে চাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম অনায়াসলব্ধতায় ঘুরে ফিরে আসবে।

হিমালয়ের পাদদেশে থকে উত্থিত নদীবিধৌত ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। ১৯৪৮ সালে বাঙালিদের উপর এদেশে ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন ও সেই সাথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এদেশকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তিনি এদেশে মানুষের মাঝে জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে সাংগঠনিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে কিশোর বয়স থেকেই তিনি ছিলেন সোচ্চার। অন্যদের চেয়ে ছিলেন আলাদা। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক এবং খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে এসেছিলেন। যাওয়ার আগে তারা ভাবলেন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শন করবেন। এ উপলক্ষে একটি সভা হলো স্কুলের মাঠে। সম্মানিত অতিথিদের থাকার ব্যবস্থাও হলো ডাক বাংলোয়। অনুষ্ঠিত সভার কাজ শেষ হলে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্মক্লান্ত শরীর নিয়ে ডাকবাংলোয় ফিরছিলেন। সম্মানিত অতিথিদের সাথে নিয়ে ফিরছিলেন স্থানীয় নেতারা এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিলাস বাবু। এ সময় কিশোর মুজিব যিনি সকলের মুজিব ভাই, তিনি সমমনা কিছুসংখ্যক ছাত্রকে নিয়ে পুলিশী প্রহরা এবং স্থানীয় নেতা-কর্মী পরিবেষ্টিত ডাকসাঁইটে মন্ত্রীদ্বয়ের পথ আগলে দাঁড়ালেন। এ সময় পুলিশ ও অন্য নেতারা পথ ছেড়ে দেয়ার জন্য ধমকাতে লাগলেন কিন্তু কিশোর মুজিব অনড়– পথ ছেড়ে না যেতে। এভাবেই কিশোর মুজিব দুই নেতার দৃষ্টি কেড়েছিলেন ছেলেবেলাতেই। এটি ছিল ১৯৩৮ সালের ঘটনা। বলা যায় এর আগে থেকেই তিনি ভেতর থেকে রাজনীতির টান অনুভব

করতেন। ছোট্ট কিশোর মুজিব রাজনীতি না বুঝেও রাজনৈতিক সভায় যোগদান করতেন। সে সময় স্বরাজ পার্টির সভায় যোগদান করতেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম কিশোর মুজিবের মনকে আন্দোলিত করতো। সে সময় থেকেই নিজে নিজেই রাজনৈতিক সচেতনতা তার মনের কোণে জায়গা করে নিতে থাকে। কারণ, একেবারে অল্প বয়স থেকেই তিনি পশ্চাৎপদ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সেবা এবং কল্যাণে এগিয়ে যেতেন নিজ থেকেই। এসব কাজের জন্য কেউ যেমন তাকে চাপ প্রয়োগ করেননি তেমনি পরিবার থেকে কিংবা চারপাশ থেকে এবং মা-বাবার কাছ থেকে তিনি বাধা পাননি। ছেলেবেলা থেকেই যেখানে তিনি অন্যায় এবং অন্যায্যতা দেখেছেন সেখানেই গেছেন তিনি সর্বশক্তি ও মেধা দিয়ে সে বৈষম্য বা অন্যায্যতা দূর করতে। তার সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা ধীরে ধীরে এসব কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হতে থাকে জনমনে এবং তীক্ষ্ণধী নেতাদের মনেও মুজিবের নামটি ফুলের কুঁড়ির মতো ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে চারদিকে সুবাস ছড়িয়ে পড়ে যেমন তেমনি এক সময় একটি পূর্ণাঙ্গ ফুলরূপেও তিনি প্রতিভাসিত হন সবার নজরে। এ বাংলায় এমন একটি ফুলের গন্ধ এবং সৌন্দর্যে মানুষ মোহিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই সৌন্দর্যের পাশাপাশি দীর্ঘদেহী সুঠামদেহের মানুষটির দৃঢ়তা, অসীম সাহস, বলিষ্ঠ যাদুকরী কণ্ঠ এবং রাজনৈতিক সমৃদ্ধ প্রাজ্ঞতা ধীরে ধীরে অজপাড়া গাঁয়ের খোকাকে 'খোকা থেকে জাতির পিতায় পরিণত করে।

১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন এবং অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর নিযুক্ত হন।

১৯৪০-এর জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৩ সালে মুসলিম ছাত্রলীগ নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে ছাত্রলীগ নামটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ ছিল তৎকালীন মুসলিম লীগের যুবসমাজের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৪১ সাল থেকেই তিনি এ কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েই তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও একাগ্রতার কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কোটারী মুসলিম লীগের বিপরীতে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসেমের জনতা মুসলীম লীগ তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত করার ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। তার বিশ্বাস ছিল লাহোর প্রস্তাব অনুসারে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান হবে। এবং এ দুটি রাষ্ট্রেই সকল নাগরিক সমান অধিকার পাবে। তেমনিভাবে হিন্দু অধ্যুষিত ভারতবর্ষের অপর অংশেও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সকল নাগরিক সমান অধিকার পাবে।

সিপাহি বিদ্রোহ ও ওয়াহাবি আন্দোলনের ঘটনা তাকে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা তাকে মর্মাহত করে। তিনি দাঙ্গা বিরোধী ভূমিকায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। দাঙ্গা প্রতিরোধের সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথেও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কাজ করেছিলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে তিনি কলকাতায় একটি বিরাট শান্তি সমাবেশে যোগদান করেন। মহাত্মাগান্ধীর দাঙ্গা বিরোধী ঘোষণার সাথে সাথে হাজার হাজার লোক চিৎকার করে উঠলো 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই'। সমস্ত আবহাওয়া মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। তরুণ শেখ মুজিব মহাত্মাগান্ধীর এ সম্মোহিনী ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পরেই সরকার নিপীড়ন শুরু করে এবং ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ চালায়। মুসলিম লীগের নেতৃত্ব কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে চলে যায়। যুব সমাজকে সংগঠিত করার জন্য তার নেতৃত্বেই কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে চলে যায়। যুব সমাজকে সংগঠিত করার জন্য তার নেতৃত্বেই ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম ছাত্রলীগ গঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৩ সালে পরিস্থিতি অনুকূল হলে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে দলীয় নামকরণ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ করা হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের সংবিধান সভায় মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করলেন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক- কারণ পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর ভাষা হলো বাংলা। ছাত্রলীগ ও তমুদ্দীন মজলিস প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল বাংলা ও উর্দু এ দুই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। পরে যুক্তভাবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং ১১ মার্চকে বাংলাভাষা দাবি দিবস ঘোষণা করা হয়। ১১ মার্চ সভা-সমাবেশ থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেককে গ্রেফতার করা হয়। ফলে আন্দোলন আরো গতি লাভ করলো। ১৯ মার্চ জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করলেন উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনেও একই কথা বললেন। দুটি সভাতেই তার সামনে না না বলে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। অধিকারের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীসহ অন্য নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও দলের যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বে থেকে অন্যতম সংগঠক হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন অঞ্চলে সভা-সমাবেশ হতে লাগলো। এরই একপর্যায়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি সমাবেশ শেষে নৌকায় ঢাকায় আসার পথে আব্বাস উদ্দিনের গান তাকে মুগ্ধ করে। আব্বাস উদ্দিন বলেছিলেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। সে জন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। তার একথাগুলো তরুণ শেখ মুজিবকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি কথা দিয়েছিলেন এবং এর জন্য তিনি মরণপণ সংগ্রামও করেছিলেন। নেতা শেখ মুজিব কথা রেখেছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখ মুজিবসহ অন্যরা জেলে রাষ্ট্র ভাষা বাংলা ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি আমরণ অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারিতে রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকে রক্ত দিয়ে আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যান। এ আন্দোলন শহর, বন্দর, গ্রামগঞ্জে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করে। ১৯৪৭ সাল থেকে মুজিবকে বারবার কারা অন্তরীণ করা হয়। এ সময় জেলের বাইরে যেমন- জেলের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন স্তরের জনগণের সাথে তার মেলামেশার সুযোগ হয়। ফরিদপুর জেলে একই কক্ষে তার সাথে কিছুদিন ত্যাগী জননেতা ফনীভূষণ মজুমদার ও সমাজ সেবক চন্দ্র ঘোষ অবস্থান করেছিলেন। তাদের সান্নিধ্য শেখ মুজিবের সার্বজনীন ভাবনাকে আরো শাণিত করে। অসুস্থতার সময় তাদের সেবা-যত্ন তাকে আবেগাপ্লুত করে। চন্দ্র বাবু মৃত্যুশয্যায় শেখ মুজিবকে দেখতে চাইলে তিনি দেখা করেন। চন্দ্র ঘোষ তখন বলেছিলেন মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখো। শেখ মুজিব বললেন, 'চিন্তা করবেন না আমি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখি'। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান বলে কিছু নেই। সকলেই 'মানুষ'। বয়সের এ পর্যায়ে রাজনীতিতে এ ধরনের পরিপক্বতা অসাধারণ। ইতিমধ্যে শেখ মুজিব ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনিসহ কয়েকজন বহিষ্কৃত হন। শেখ মুজিব মুচলেকা দিয়ে ছাত্রত্ব ফিরে নেননি। এতে তার আপসকামিতা নয়, মানসিক দৃঢ়তাই প্রকাশ পায়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ২১ দফার ভিত্তিতে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী, নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের নিকট মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। নেতা শেখ মুজিব এ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রধান সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে মুসলিম লীগের রাজনীতির বিপরীতে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার পক্ষে জনগণ ম্যান্ডেট দেয়। যে ২১ দফা ছিল স্বাধিকার ও জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কর্মসূচি। ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্যুৎ করে রাজনীতি ও নির্বাচনে এটিই ছিল প্রথম অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন। এরই ধারাবাহিকতায়

আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগে রূপান্তরিত হয়। রাজনীতি ও সরকারে ভাঙ্গাগড়ার এক পর্যায়ে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে পর্যুদস্ত করা হয়। জননেতা শেখ মুজিব উপলব্ধি করেন যে এ অঞ্চলের স্বাধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে। তাই তার উদ্যোগে ১৯৬০ সালে বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট (বি.এল.এফ) গঠিত হয়। চল্লিশ বছর বয়সে শেখ মুজিব সাংগঠনিক ক্ষমতা, চিন্তা-চেতনায় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে তখন রাজনৈতিক অঙ্গনে তাকে শক্তিশালী নেতা ও সমস্যা সমাধানে পারদর্শী হিসেবে গণ্য করা হতো। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে সাজাপ্রাপ্ত সিনিয়র মুসলিম লীগ নেতা (পরবর্তীকালে মন্ত্রী) সবুর খান এতটাই ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে, জেলে শেখ মুজিবের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, 'মুজিব একটা কিছু করো, এদের (পাকিস্তানিদের) সাথে আর থাকা যায় না।' রাজনীতিতে ধীশক্তি, গভীর উপলব্ধি এবং দূরদৃষ্টির কারণে তিনি বুঝতে পারেন যে, আন্তর্জাতিক সমর্থন বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শক্তির সাহায্য ছাড়া জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দুরূহ ব্যাপার। সে কারণে ১৯৬১ সালে ভারতের আগরতলায় গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে জনগণকে সুসংগঠিত করার জন্য তিনি ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা পেশ করেন। এর ভিত্তিতেই ৭ জুন হরতাল পালিত হয় এবং শেখ মুজিবকে এর পূর্বেই গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিবকে হত্যা করার জন্য ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি শাসকরা আগরতলা মামলা শুরু করে। তার মনোবল কতটা দৃঢ় ছিল এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে কিভাবে পৌঁছানো যাবে তার ধারণা পাওয়া যায় প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী উপস্থিত হলে তার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'জনগণ আমাদেরকে বের করে নেবে। এরপর নির্বাচন হবে এবং জনযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হবে।'

১৯৬৯ সালে ৬ দফা সংবলিত ১১ দফার ভিত্তিতে গণঅভ্যুত্থান হয়। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দী মুক্তি পায়। সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনায় জনগণের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু উপাধী দেয়া হয়। এ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' হবে'। মাত্র দুই দশকের

আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জাতিসত্তার পূর্ণতা লাভ করে এটা পৃথিবীতে বিরল ঘটনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চার হাজার বছরের অধিককাল থেকে এ অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বসবাস শুরু করে। আমাদের রয়েছে প্রায় তিন হাজার বছরের ইতিহাস। মৌর্য শাসনের সময় মহাস্থানগড়কে কেন্দ্র করে বঙ্গ অঞ্চলের প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত রাস্তা তৈরির মাধ্যমে এ অঞ্চলকে অন্য অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। মুঘল সম্রাট আকবরের সময় ঢাকাকে কেন্দ্র করে সুবে বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পাল, সেন, সুলতানি আমলে এ অঞ্চলের স্বকীয়তা গড়ে উঠে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এদেশের জনগণ এ অঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে এগিয়ে চলে।

বঙ্গবন্ধু '৭০'র নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। তার লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে প্রমাণ করা যে জনগণ স্বাধিকারের পক্ষে। পাশাপাশি নির্বাচন বানচাল এবং ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে ভারতের সাথে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীকালের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ তা প্রমাণ করে। ডিসেম্বরে '৭০'র নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং ভোটের শতকরা ৮০% পেয়ে বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করেন যে, জনগণ ৬ দফার ভিত্তিতে স্বাধিকারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ। ১৯৭০-এর ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান তার ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে ঘোষণা করেন: এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। পহেলা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের জনগণের সভা, সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ইসতেহার পাঠ এবং ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু ভবনসহ সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। এসকল কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সকল জনতা একই ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তিনি নেতৃবৃন্দকে আক্রান্ত হলে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন এবং এও বলেন ভারত আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করবে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর যোগাযোগের প্রেক্ষিতে '৭০-এর মার্চ মাসে ভারতের দেরাদুনস্থ কালসীতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

স্থাপন করা হয়। যুদ্ধ চলাকালে বিএলএফ (মুজিব বাহিনী)-এর ট্রেনিং-এ তা প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়। '৭০'র জুলাইয়ের দিকে বিপ্লবী ত্রৈলক্ষ্যনাথ মহারাজ বঙ্গবন্ধুর বার্তা নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কলকাতায় গর্ব করে সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনতা ও যুবসমাজ জেগেছে, তারা স্লোগান দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু, শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, নেতাজী ও সূর্যসেনের বাংলা জেগেছে; আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ; জয় বাংলা। ২৫ মার্চে পাক-বাহিনী এদেশের জনগণের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালালে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। ইয়াহিয়া খান তার ভাষণে যে কথাটি বলেন তা হলো 'শেখ মুজিবকে এবার শাস্তি পেতে হবে'। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পূর্ব পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা ছিল বলেই দ্রুততম সময়ে ১০ এপ্রিল সরকার গঠন, ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশকে বিভিন্ন সেক্টর ও অঞ্চলে বিভক্তকরণ এবং ভারতের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি), তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগরে সরকার গঠিত হয়। এ সরকারের অন্যতম দু'জন ছিলেন এম. মুনছুর আলী ও কামরুজ্জামান। বঙ্গবন্ধুর নামেই মুক্তিযুদ্ধের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়-তিনিই হলেন মহানায়ক।

এ সরকার বিশ্বব্যাপী পাকিস্তানিদের গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু কন্যা শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়দান, হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র এবং রসদ দিয়ে সর্বাত্মক সাহায্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও শক্তিসমূহের সমর্থন আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে পাকিস্তানি আদালতে বঙ্গবন্ধুকে আনা হয়েছিল। আইয়ুব খানের ডায়েরি থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করছেন না, তারা যা ইচ্ছা করতে পারে এবং তারপর বললেন 'জয় বাংলাদেশ'। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে এ ধরনের বক্তব্য পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে যৌথভাবে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী পাকিস্তানিদের পরাজিত করে। লাখ লাখ বাংলাদেশের শহীদদের সাথে হাজার হাজার মিত্রবাহিনী আত্মদান করে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে প্রমাণিত হলো; রক্ত দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো,

এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো। ৯৩ হাজার পাকবাহিনীর আত্মসর্ম্পণের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে লন্ডন আসেন এবং সেখান থেকে দিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি মুক্ত বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ঐদিনই লাখ লাখ জনতার সামনে আবেগআপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে, এর ভিত্তি ধর্ম হবে না। তিনি এ ভাষণে এবং দিল্লিতে সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভারত ও বিশ্ববাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে কেন তার এতো মিল, এটা হলো আদর্শের মিল। দীর্ঘ সংগ্রামের নীতিমালা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও শোষণমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতেই তার নেতৃত্বে দ্রুততম সময়ে ১৯৭২ সালেই সংবিধান রচিত হয়। যা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন এবং বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য দিকনির্দেশনা দেন। যার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে স্থিতিশীলতা এসে যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়-এ নীতিতে তিনি অগ্রসর হন। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ, জাতিসংঘ অনুষ্ঠানে যোগদান ও বাংলায় ভাষণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদার আসনে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৭২ সালে কলকাতায় তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সহযোগিতার কথা বলেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিপূরক। সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ভারতের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং মিত্র বাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

বঙ্গবন্ধুর সময়ে ভারতের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সীমান্ত চুক্তি এবং পানি বণ্টনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, তা অব্যাহত থাকলে ভারতের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতাম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হতো। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জনগণের বিশেষ করে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৭৫ সালে তিনি কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং সর্বস্তরের লোকজনকে একটি প্লাটফরমে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানানোর চক্রান্ত হয়। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ইউরোপে থাকার কারণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচেছিলেন। এ হত্যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও

মূল্যবোধ ধ্বংস করা এবং গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা। পঁচাত্তরপরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাবলী তা প্রমাণ করে।

বাঙালিদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শেখ মুজিব সব সময় ছিলেন সোচ্চার, আপসহীন, অনমনীয়। তিনি অন্যায়ের কাছে আপস করেননি কখনো। নিজের এবং পরিবারের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বড় করে দেখে লোভের জিহ্বাকে প্রসারিত হতে দেননি। ক্ষণজন্মা এই মহা পুরুষ এ দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম করতে জীবনের অধিকাংশ সময় জেলের অন্তরীণ কাটিয়ে ছিলেন। রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে চৌদ্দটি বছর কারাভোগ করেছেন। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি তিনি। মাঝপথে রণেও ভঙ্গ দেননি। বরং নতুন উদ্যমে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। একদিনে তিনি বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা এবং স্থপতি হতে পারেননি। এর জন্য দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে জীবন বাজি রেখে মৃত্যুকে পরোয়া না করে তিনি বলেছিলেন রক্ত যখন দিয়েছি আরো দেব– এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এভাবেই তিনি খোকা থেকে জাতির পিতায় পরিণত হয়েছিলেন বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডে।

সত্তরের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

মফিদা আকবর

অখণ্ড পাক-ভারত ভূখণ্ডে ব্রিটিশের প্রায় দুইশ বছরের কর্তৃত্বের অবসানের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আলাদা একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অর্থাৎ পাক ভারত ভাগ হয়ে যায়। ভারত এবং পাকিস্তান দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলাকে একিভূত করে দেয়া হয়। অথচ যখন ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন, তখন তিনি দেখলেন যে, মুসলিম লীগের পাকিস্তান আর কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের অধীনে বাংলার ভবিষ্যৎ রক্ষিত হবে না। তাই তিনি স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার দাবি করেন। ইংরেজ সরকার এ দাবি উপেক্ষা করে পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার ভাগ্য জুড়ে দেয়। যদিও পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলার ভৌগলিক দূরত্ব প্রায় ১২০০ মাইল।

'৪৭ থেকে '৭১ দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলা শাসন করে। শাসনের অন্তরালে শোষণই ছিল মুখ্য বিষয়। ইতিহাসের নিরিখে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ মূলত একটি শেকড়ে প্রোথিত ছিল এবং ভৌগোলিক সীমানাও ছিল পাশাপাশি। দীর্ঘদিনের ভাষা সহাবস্থান, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, চলনে বলনে একই হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একিভূত করা হয় পূর্ব বাংলাকে। এদিকে পূর্ব বাংলার জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা শুরু থেকেই আশ্রিত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। পূর্ব বাংলা রূপান্তরিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এই সত্যটি উপলব্ধি করলো যে, শুধু একচেটিয়া প্রভুত্বের হাত বদল হয়েছে। নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের শাসন-শোষণ, নির্যাতনের হাত প্রসারিত হতে হতে আকাশ ছুঁয়ে যায়। বাঙালিদেরও পিঠ ঠেকে যায় দেয়ালে।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের মর্মমূলে যখন আঘাত হানে তখনই মূলত দ্বন্দ্বের শুরু প্রধানত ভাষার অধিকার প্রশ্নে

এবং স্বায়ত্ত শাসন প্রশ্নে। জনসাধারণ এই সত্যটি উপলব্ধি করলো যে, এটা একচেটিয়া প্রভুত্বের হাত বদল হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের মূলত দ্বন্দ্বের শুরু প্রধানত ভাষার অধিকার এবং স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে। কেন্দ্র থেকে বারোশ' মাইল দূরবর্তী একটি প্রদেশ পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত গোষ্ঠী তাদের শাসন-শোষণ নিরঙ্কুশ রাখার স্বার্থে বিশেষত দুটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়ার নীতি অবলম্বন করে। এর মধ্যে একটি হলো ভারত ভীতি, অপরটি হলো ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম। যে কারণে দেখা গেছে, যখনই ধর্মভীরু পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনচেতা জনগণ নায্য দাবি কিংবা অধিকারের প্রশ্নে দাবি উত্থাপন করেছে অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের বিষয়গুলোকে অভিযোগ আকারে সামনে এনেছে তখনই পূর্ব বাংলার জনগণকে ভারতের চর বা কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। প্রকাশ্যেই দেশদ্রোহী হিসেবে এসব জনগণকে চিহ্নিত করেছে। পূর্ব বাংলার জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা শুরু থেকেই আশ্রিত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এরপর প্রথমেই বাঙালিরা ধাক্কা খায় (ক) ভাষা প্রশ্নে কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় ভাষায় সমর্থনে উর্দুকেই ইসলামী ভাষা হিসেবে দাবি করলেন এবং এর বিরুদ্ধে বাংলায় যখন বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে এটা প্রমাণ করতে চাইলো যে, বাংলা মূলত সংস্কৃতেরই একটি অংশ। সংস্কৃত থেকেই বাংলার জন্ম। বাংলাকে 'বিজাতীয়' ভাষা বলেও উপহাস করা হলো।

পশ্চিমীদের মতে, এই ভাষা ব্রাহ্মণ্যবিদদের ভাষা। ফলে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে কিছুতেই বাংলা ভাষা অন্তর্গত হয়ে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না 'উর্দু' একমাত্র উর্দুই হবে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় ভাষা।

(খ) পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কোনো একটি ক্যাডেট কোর্সে গড়পড়তা ১৫০ এবং অকস্মাৎ খুব বেশি হলে বারো থেকে পনেরোজনের উপরে নয়। এই স্বল্পসংখ্যকের ওপর আবার ছাঁটাইয়ের খড়্গ তো ছিলোই। বিভিন্ন ছোটখাটো অজুহাতে প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে যখন-তখন বাঙালি ক্যাডেটদের নির্দ্বিধায় বের করে দেয়া হতো। অথচ একই অপরাধে এবং তার চেয়েও বেশি গুরুতর অপরাধে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্যাডেটদের ছাঁটাই তো দূরের কথা, তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হতো না– এমনকি ন্যূনতম ডেকেও জিজ্ঞেস করা হতো না তাদের অপরাধ সম্পর্কে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পশ্চিমাদের হিংস্রতা প্রকাশ পেতো বাঙালিদের উপর।

গ. পূর্ব বাংলার অর্থকড়ি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গড় উঠতে থাকলো মিল-কারখানা। অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্রুত সমৃদ্ধ হতে থাকলো পশ্চিমের প্রতিটি প্রদেশ।

ঙ. চাকরি ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেতে থাকলো পশ্চিমারা। পাশাপাশি পূর্ব বাংলার জনগণ আশ্রিত এবং রিফিউজি হিসেবেই আখ্যায়িত হতে থাকলো।

চ. পূর্ব বাংলায় ব্রিটিশ আমলে যে উন্নয়ন হয়েছিল পশ্চিমা শাসনামলে এর ছিটেফোটোও হয়নি।

ছ. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নীতিতে ঐক্যের নামে যে, অস্পৃশ্য দর্শনের চর্চা করা হতো তার একটি দিক ছিলো যেমন : ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধের আগ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৪ শতাংশ মানুষের প্রতিরক্ষার জন্য নিয়োজিত করা হয় ১২টি পদাতিক ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডসহ আনুমানিক ২টি ট্যাংক ডিভিশন। এর বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ ছিলো ৩টি পদাতিক ব্রিগেডের সমন্বয়ে গঠিত ১টি মাত্র ডিভিশন। বিমান বাহিনীর ৯৫ শতাংশই ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো সামরিক উপস্থিতির নিদর্শনস্বরূপ মাত্র ১০টি স্যারের এফ জঙ্গি বিমান। নৌবাহিনীর সবটাই ছিলো পশ্চিমে। পূর্ব পাকিস্তানের জলসীমায় ছিলো গোটাতিনেক সেকেলে ধরনের গানবোট।

জ. বর্ণবৈষম্যও একটি বড় বিষয় ছিল। পশ্চিমারা পূর্ব পাকিস্তানের কালো বর্ণের এবং দৈহিক কম উচ্চতার জন্যও খুব ঘৃণার চোখে দেখতো।

ঝ. খাবার-দাবার, পোশাক-আশাকসহ বাঙালিদের প্রত্যেকটি বিষয়েই পশ্চিমীদের এলার্জি ছিলো।

এরকম অসংখ্য বিষয় আছে যা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু অনেক সময় তা প্রকাশ করা যায় না। কারণ, অনেকে অপকৌশল এতো সূক্ষ্মভাবে তারা করে ফেলতো যে, বোঝার আগেই বিষয়টি ঘটে যেতো।

যা ছিল দৃশ্যমান। অন্যদিকগুলো তেমনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। দৃশ্যত ও অদৃশ্যতর মধ্যে জাতিগত বৈষম্য এবং নিপীড়ন-দমনমূলক আচরণের যে প্রাধান্য ছিলো তা সাদা চোখেই বোঝা যেতো। আর অদৃশ্যত, বিষয়গুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করলেই বোঝা যেতো।

বাঙালির এই তীব্র আত্মোপলব্ধি থেকেই একদিন শুরু হয়েছিল '৫২'র ভাষা আন্দোলন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন, ১৯৬২ সালের আন্দোলন, ১৯৬৫ সালের আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানের গণচৈতন্যের ভেতর দ্রুত এগিয়ে আসা। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে পূর্ব বাংলার জনগণরা ততদিনে অনেকখানি দুর্মর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে। এই পরিস্থিতিতেই ১৯৬৯ সালের গণজাগরণের মধ্য দিয়ে প্রায় দুই দশকের আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বাঙালিরা আশাবাদী হয়ে

উঠেছিলো। কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক মানসিকতার ব্যাপক প্রয়োগ পূর্ব বাংলার মানুষের মনে প্রকারান্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করে। '৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, পরবর্তীকালে ৬ দফার ভিত্তিতে '৬৮, '৬৯'র গণজাগরণ এবং '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়– এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালিদের আপসহীন মনোভাবের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রকাশ পেয়েছে।

'৪৭ সাল থেকে '৭১ দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হীনমন্যতা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বাঙালিদের নিজেদের জাতিসত্তা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সর্বোপরি, মাতৃভাষা, নিজভূমে স্বাধীনভাবে বাঁচার, বসবাসের অধিকারের প্রতি দ্রুত মনোযোগী করে তুলেছিল ক্রমান্বয়ে।

১৮৮৫ সালে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস নামে যে প্রতিষ্ঠানটি বিশাল, প্রতিষ্ঠিত দল হিসেবে ভারতে দাপটের সাথে আজও ক্ষমতায় আসীন। সেই কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গ, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশের সৃষ্টি করে। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। সশস্ত্র ও যুগান্তর দল গঠিত হয়। বাংলার দামাল ছেলেরা সশস্ত্র যুদ্ধ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এগিয়ে আসে। ক্ষুদিরাম, বাঘা যতিন, সূর্যসেন প্রমুখ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। শত শত বিপ্লবী ইংরেজ সরকারের নিপীড়নের শিকার হয়। বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাদের অবদান চির স্মরণীয়।

আগেই উল্লেখ করেছি, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের দাবির প্রেক্ষিতে আইনসভায় পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু হয়। ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলন এবং ১৯২১ সালে অসযোগ আন্দোলন শুরু হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের রাজনীতি উচ্চ শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

তাঁদের কর্মসূচির মধ্যে কৃষক-শ্রমিকের দাবি ছিল উপেক্ষিত। শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক নিপীড়িত কৃষক প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। তার আহ্বানে বাংলা কৃষকসমাজ দারুণভাবে সাড়া দেয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৪০ সালে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একাধিকবার স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন। পরে মুসলিম লীগ তার প্রস্তাবকে পরিবর্তন করে পাকিস্তান দাবি

করে। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে "ভারত ছাড়" আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি দেখলেন মুসলিম লীগের পাকিস্তান এবং কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের অধীনে বাংলার ভবিষ্যৎ রক্ষিত হবে না। তাই তিনি স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার দাবি করেন। ইংরেজ সরকার স্বাধীন বাংলার দাবি উপেক্ষা করে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। বাংলা বিভক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ। স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে রাজা শশাঙ্ক, পাল রাজা, গৌড়ের সুলতান ও বারো ভুঁইয়াগণও। এরপর স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। উপরোক্ত আপসহীন ত্যাগী নেতাগণের দেখা স্বপ্নকে লালন করে বুকে ধারণ করে বাঙালিদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শেখ মুজিব সব সময় ছিলেন সোচ্চার, অনমনীয়। তিনি অন্যায়ের কাছে আপস করেননি কখনো। নিজের এবং পরিবারের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বড় করে দেখে লোভের জিহ্বাকে প্রসারিত হতে দেননি। অর্থাৎ এককভাবে নিজের সুখ-সুবিধা বা পদ-পদবীর লালসায় তিনি কখনো পশ্চিম পাকিস্তানি প্রভুদের কাছে মাথানত করেননি। এজন্য বছরের পর বছর কারা ভোগ করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেননি তিনি। মাঝপথের রণেও ভঙ্গ দেননি বরং নতুন উদ্যমে আবার সংগ্রাম-আন্দোলন চালিয়ে যাবার প্রয়াস পেয়েছেন। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলনই ছিল মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত রূপরেখা। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অধিকার প্রশ্নে যেসব দফা তিনি দিয়েছিলেন এসবই সুদূর প্রসারী চিন্তাপ্রসূত ছিল। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ছয়দফার আন্দোলনই পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভিত নাড়িয়ে দেয়। তারাও বুঝতে পারে যে, বাঙালিদের আর বেশিদিন দমিয়ে রাখা যাবে না। তবুও তাদের কূটচাল বন্ধ থাকে না। ক্রমশ তাদের কূটচালের রশি আরো প্রসারিত হতে থাকে। ৬৬'র পর '৬৯-এর গণআন্দোলনে বাঙালিদের গণজাগরণ দেখে তারা আরো ভীত হয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য, যদি কোনভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নমনীয় করা যায় বিভিন্ন প্রশ্নে– তাহলেই তার গদি ঠিক থাকে না হলে টালমাটাল হয়ে যায়। গোলটিবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন যে, আইয়ুব খানের চৈতন্যোদয় হবে যে, ২১ বছরের শাসন- শোষণের ফলে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে এর প্রতিকারে আলোচনা করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি সমঝোতায়

আসবেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেলো আইয়ুব খান সেদিকে অগ্রসর হলেন না। দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ফলপ্রসূ হলো না। রাওয়ালপিন্ডির বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন কিছুতেই আপসহীন নেতা শেখ মুজিবকে কোনোভাবেই নতি স্বীকার করানো যায়নি। যেহেতু তার গদি টালমাটাল- অতি ধূর্ত আইয়ুব কালবিলম্ব না করে পদত্যাগ করে ইতিহাসের বিচারে জঘন্য ব্যক্তি জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দ্রুত সরে পড়েন।

বাঙালিদের জীবনের মোড় নেয় নতুন চক্রান্তের অধ্যায়ে। নতুন করে শুরু হয় চক্রান্ত। অর্থাৎ আইয়ুবের পাতানো খেলাই ইয়াহিয়ার হাত দিয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে শুরু হয় নতুনভাবে। তিনি বক্তব্য-বিবৃতিতে ভালো ভালো কথা বলেন কিন্তু অদৃশ্য হাতের ইশারায় চক্রান্তের জাল বিস্তৃতই হতে থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের অন্তরালে কেন্দ্রীয় শাসনের রূপচ্ছবিই ফুটে উঠে সর্বত্র। যদিও মাঝে মাঝে ইয়াহিয়া তার বক্তব্যে বলেন, শীঘ্রই দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার কথা। মূলত এসব ছিল কথার কথা। এদিকে সাধারণ নির্বাচনের লক্ষ্যে মুজিবের নেতৃত্বে আন্দোলন-সংগ্রাম চলতে থাকে। তিনি ব্যাপকভাবে সারাদেশে সফর করেন এবং জাতীয় শ্রমিক লীগ গঠন করেন। এ সময় এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, যেদিন ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক-মধ্যবিত্তের সমস্যার সমাধান হবে, সেদিন হবে আমার রাজনৈতিক জীবনের সার্থকতা আর সেজন্য প্রয়োজন ছাত্র-শ্রমিক, কৃষকের একতা। শেখ মুজিব দেশব্যাপী ব্যাপক সফর করেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আন্তর্জাতিক সফরেও বের হলেন। তিনি ১৯৬৯-এর ২৫ অক্টোবর লন্ডন সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

এদিকে ১ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হলো। কিন্তু উর্দু ভাষায়। এভাবে একের পর এক চক্রান্তের নীল-নকশা যখন প্রকাশ্যে হতে থাকে তখনই মুজিব রুখে দাঁড়ান। এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে বাধ্য হন মুজিবের অনমনীয়তার প্রশ্নে। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয় এবং নির্দিষ্ট তারিখেই নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এর মাঝে অনেক ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোরা। সবকিছুর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সত্তরের নির্বাচনে।

উত্তাল মার্চের দিনগুলো

মফিদা আকবর

ইতিহাস বরাবর ঐতিহ্যকে ধারণ করে থাকে। কালের বিচারে নিরপেক্ষ, সর্বজনগ্রাহ্য নিরীক্ষণ থেকে সত্য বিচারে যে দলিল জনসমক্ষে টিকে থাকে তাকেই আমরা সঠিক হিসেবে নিরূপণ করে থাকি। কালের বিচারে এবং বিবর্তনে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় আর তা হলো মার্চ মাস। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঘুমন্ত বাঙালির উপর নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তানীরা। যা ইতিহাসে বিশ্বের সকল বর্বরতাকে হার মানায়। এই মার্চকে বিশ্লেষণ করতে হলে আরো একটু অতীতে গেলে দেখা যাবে যে, ব্রিটিশ ভারতে ১৮৫৭ সালে যখন প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধ সংঘটিত হয় এর সূচনা হয় ১২ মার্চ। এই উপমহাদেশের স্বাধীনতার রূপরেখা ঘোষিত হয়েছিল ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালির প্রথম জাগরণ ঘটে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ দেশে যে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেটা ছিল ১৯৫৪ সালের ৯ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ছয় দফার আত্মপ্রকাশও ঘটে ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ। আইয়ুব খানের কাছে ছয় দফার রূপরেখা পেশ করেন ১৯৬৯-এর ১০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে। বাঙালি ছাত্র-জনতার উত্তাল তীব্র আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন ঘটে ১৯৬৯-এ ২৫ মার্চ। কালের বিবর্তনে দেখা যায়, বার বার ঘুরেফিরে মার্চ মাসকে ঘিরেই আন্দোলন বেগবান হয় এবং এক পর্যায়ে সেই আন্দোলন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একটি ইতিহাসে পরিণত হয়। এরকম ইতিহাসের ক্রমধারাবাহিকতায় ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পরপরই ইয়াহিয়া ভুট্টোর ঝড়যন্ত্রের জাল ক্রমবিস্তরিত হতে থাকে। তারা আলোচনা বৈঠকের নামে বার বার কালক্ষেপণ করতে থাকে। ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের পর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি দুই মাস চলে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে না। অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয় বার বার। ১৯৭১-এর ১ মার্চে ১.০৫ মিনিটে বেতারে ঘোষণা করা হলো যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মার্চ মাস বাংলা কিংবা ব্রিটিশ ভারতেও উল্লেখযোগ্য একটি মাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও যেমন মার্চ মাস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের আগের যুদ্ধটাই ছিল অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল মার্চ। পুরো মার্চ মাসব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। মুক্তিযুদ্ধের আগের অধ্যায় গৌরবদীপ্ত অধ্যায় অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলনে যদি বঙ্গবন্ধু সঠিক নেতৃত্বের পরিচায়ক না হতে পারতেন এবং কোনো একটি সিদ্ধান্ত যদি ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যেত কোনক্রমে তাহলে ২৫ মার্চের মধ্যরাতে যে নারকীয় হত্যার সূচনা করেছিল পাকিস্তানীরা সে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সামাল দিয়ে এ দেশের জনগণ কখনো মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস পেত না। মূলত ১লা মার্চ থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়। যদিও ৩রা মার্চ এর পূর্ণতা লাভ করে। এরপর অসহযোগ আন্দোলন প্রতিদিন বেগবান হতে থাকে।

অসহযোগের উত্তাল মার্চের দিনগুলি

১লা মার্চ : দুপুর ১টা ৫ মিনিটে বেতারের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা প্রচারিত হবার সাথে সাথে সকল স্তরের মানুষ অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে মিছিল সহকারে হোটেল পূর্বাণীর সামনে সমবেত হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মিছিলকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন এবং পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তার অসহযোগ আন্দোলনের প্রাথমিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বিকালে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতারা সেখানে বলিষ্ঠকণ্ঠে বক্তৃতা করেন।

২রা মার্চ : সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক ছাত্র-জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব সেখানে প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। বিকাল ৩টায় পল্টন ময়দানে মোজাফফর ন্যাপের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩রা মার্চ : এদিন জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। সকাল ১১টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের এবং বিকাল ৪টায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। সভাশেষে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এক বিশাল গণমিছিল বের হয়।

৪ঠা মার্চ : এদিনও সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বেলা ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্রলীগ ও ১১টায় ছাত্র ইউনিয়নের গণজমায়েত এবং ৪টায় বায়তুল মোকাররম থেকে মজদুর ফেডারেশনের মিছিল বের হয়।

৫ই মার্চ : এদিনও ৬ ঘন্টা হরতাল অব্যাহত ছিল। সকাল ১০টায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের প্রতিবাদ সভা ও মিছিল, সকাল ৯টায় তাজ জুট বেলিং শ্রমিকদের গায়েবানা জানাজা আদায়, সাড়ে ১০টায় বটতলায় ছাত্রলীগের সমাবেশ ও মিছিল, ১১টায় শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের সমাবেশ, জুম্মার নামাজের পর মসজিদে বাঙালির মুক্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত, বিকাল ২টায় ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের লাঠি মিছিল এবং বিকাল ৪টায় লেখক সংঘের আলোচনা সভা ও তারপর বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

৬ই মার্চ : সকাল থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। এদিনের অন্যান্য কর্মসূচি ছিলো সকাল ১০টায় নিউ মার্কেটের সামনে মোজাফফর ন্যাপের প্রতিবাদ সভা, বায়তুল মোকাররমে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর মিছিল, নিউ মার্কেটের মোড়ে মোটর-ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়নের জনসভা, ১১টায় বায়তুল মোকাররমে ছাত্রলীগের জনসভা, ২টায় এয়ারপোর্ট রোডে বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিল, আড়াইটায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র শিল্পীদের প্রতিবাদ সভা, ৩টায় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক ইউনিয়নের সভা ও মিছিল, পল্টন ময়দানে জাতীয় লীগের জনসভা, বায়তুল মোকাররমে মহিলা আওয়ামী লীগের সমাবেশ, ৪টায় শহীদ মিনারে শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে সমাবেশ, ৫টায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সভা এবং ৬টায় বায়তুল মোকাররম থেকে ছাত্রলীগের মশাল মিছিল।

৭ই মার্চ : রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জনসভা এবং সেই জনসভায় 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– বলে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা ঘোষণা। এদিনও সারাদেশে ৬ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করতে না দেয়ায় বেতার-টিভিতে কর্মবিরতি পালন করা হয়।

৮ই মার্চ : বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের মাধ্যমে বেতার-টিভিতে কর্মবিরতির অবসান। এদিন ১০ই মহররম উপলক্ষে কর্মসূচি শিথিল করা হয়।

৯ই মার্চ : হরতাল প্রত্যাহার। পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান, মশিউর রহমান যাদু মিয়া ও শাহ আজিজুর রহমানের বক্তৃতা ও সভাশেষে গণমিছিল বের করা হয়।

১০ই মার্চ : বিকাল ৪টায় শহীদ মিনার থেকে ছাত্র ইউনিয়নের পথসভা, ৫টায় বায়তুল মোকাররমে ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের ছাত্র জনসভা, লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল ও শহীদ মিনারে কবিতা পাঠ ও গণ-সংগীতের আসর, ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স ক্লাবে ফেডারেশন অব দি সার্ভিসেস এসোসিয়েশন এন্ড প্রফেশনাল বডিজের স্টীয়ারিং কমিটির জরুরি সভা করা হয় ।

১১ই মার্চ : ৪টায় ছাত্র ইউনিয়নের পথসভা ও খণ্ড মিছিল, ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা, ৪টায় ঢাকা নিউজ পেপার হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সভা ও মিছিল হয় । সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ মশাল মিছিল করে ।

১২ই মার্চ : বিকাল ৩টায় কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল অব এসোসিয়েশন/ইউনিয়ন অব দি রিপাবলিক এমপ্লয়িজ অব পাকিস্তান (কোকাপেপ)-এর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে গণসমাবেশ, ৪টায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের আলাদা আলাদা পথসভা ও খণ্ড মিছিল, ৫টায় ন্যাপের সদরঘাট টার্মিনালে পথসভা, মগবাজারে ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয় ।

১৩ই মার্চ : দুপুর ১২টায় নারায়ণগঞ্জের মাতলা স্টীমার ঘাট থেকে নৌ পরিবহন শ্রমিক সংস্থার উদ্যোগে নৌ-মিছিল । মিছিলটি নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও আদমজী হয়ে ডেমরায় যায় । ৭টায় কমলাপুর আওয়ামী লীগ অফিসে স্বেচ্ছাসেবকদের জরুরি সভা করা হয় ।

১৪ই মার্চ : ১০টায় নিউজ পেপার প্রেস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের মিছিল, ৫টায় বাংলা একাডেমীতে লেখক সংগ্রাম শিবিরের সভা, সাড়ে ৩টায় হাইকোর্ট আইনজীবীদের সভায় ৫টায় কথাশিল্পী সম্প্রদায়ের পল্টনে কবিতা পাঠ ও গণসংগীতের আসর, ৪টায় ইকবাল হলে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঢাকা শহর আঞ্চলিক শাখাসমূহের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এদিন বঙ্গবন্ধুর ৩৫ দফা নির্দেশ জারি করা হয় ।

১৫ই মার্চ : ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন । ৪টায় তোপখানা রোডে মহিলাদের সাধারণ সভা, ৭টায় বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের শহীদ মিনারে গণসংগীতের আসর, ৫টায় ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে মহকুমা পর্যায়ের আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সভা, জাতীয় শ্রমিক লীগ তেজগাঁও আঞ্চলিক শাখার অন্তর্ভুক্ত ৮৬টি ইউনিয়নের নেতাদের যৌথসভা এবং ১১৫ নং সামরিক বিধির বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

১৬ই মার্চ : বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া প্রথম বৈঠক ১০টা থেকে ১টা । ৯টায় বাংলা একাডেমীতে ব্রতচারী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা সভা, ৪টায় শহীদ মিনার থেকে চারু ও কারুশিল্পীদের মিছিল, মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের কুচকাওয়াজ ও

গুলিস্তানে জনসভা, শিল্পী সমাজের কবিতা পাঠের আসর, ভাসানী ন্যাপের কর্মীসভা ও নজরুল একাডেমীর গণসংগীতের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ই মার্চ : বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া দ্বিতীয় বৈঠক। ৪টায় ঢাকা জেলা বার সমিতির সভা ও মিছিল। ওয়াপদা এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভা, ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র ইউনিয়নের কুচকাওয়াজ, মহিলাদের কুচকাওয়াজ ও নিউ মার্কেটে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ই মার্চ : বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়ার কোন বৈঠক হয়নি। সকাল ৯টায় শহীদ মিনারে নার্সিং স্কুলের ছাত্রীদের সমাবেশ, ৫টায় শহীদ মিনারে বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারীদের সমাবেশ, আওয়ামী লীগের তহবিলে সাহায্যদানের জন্য মিরপুর বিউটি সিনেমা হলে মিরপুর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ম্যাজিক শোর আয়োজন, কৃষি উন্নয়ন সংস্থার কর্মচারী ইউনিয়নের সভায় স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকারের শপথ ঘোষণা করা হয়।

১৯শে মার্চ : জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহ। ৮টায় মিরপুরে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ, সাড়ে ৩টায় আণবিক শক্তি কমিশন কর্মচারীদের সভা ও মিছিল, বেইলী রোডে শহীদ স্মৃতি সৌধ উদ্বোধন, ৪টায় বায়তুল মোকাররমে শ্রমিক ফেডারেশনের গণ-সমাবেশ, বাস্তুহারা সমিতির গণ-সমাবেশ ও মশাল মিছিল করা হয়। ১০টায় মধুমিতা সিনেমা হলের সামনে চলচ্চিত্র শ্রমিক ও ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সভা, ৬টা জাতীয় শ্রমিক লীগের সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০শে মার্চ : বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া চতুর্থ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের কর্মচারী ইউনিয়নের শহীদ মিনারে সভা ও মিছিল সহকারে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গমন, ১১টায় ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের সভা ও মিছিল, বায়তুল মোকাররমে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন কর্মচারীদের সভা ও মিছিল, ৩টায় শহীদ মিনারে ঔষধ শিল্প কর্মচারীদের সভা ও মিছিল, ৫টায় তোপখানা রোডে লেখক সংগ্রাম পরিষদের সভা ও মিছিল, সাড়ে ৩টায় শহীদ মিনারে প্রাক্তন নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের শপথ গ্রহণ ও মিছিল, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টদের সভা, সাড়ে ৪টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদদের সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

২১শে মার্চ : ১০টায় জীবনবীমা কর্মী সমিতি, ২টায় মাধ্যমিক নৈশ ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, ৪টায় ইঞ্জিনিয়ার্স সুপারভাইজার এসোসিয়েশন, প্রেস কর্মচারী ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সভা, ৫টায় আজিমপুর গার্লস স্কুলে মহিলা সমাবেশ, বাংলা একাডেমীতে লেখক সংগ্রাম শিবিরের কবিতা পাঠের আসর ও ৪টায় সম্মিলিত শিক্ষক সমাজের মিছিল বের করা হয়।

২২শে মার্চ : সাড়ে ৯টায় সিএ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভা, গণসংগীত ও মিছিল, এজি অফিস প্রাঙ্গণে সুপারিন্টেনডেন্ট সমিতিসমূহের যৌথ সভা, ১১টায় ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের গণজমায়েত, ১১টায় বায়তুল মোকাররমে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সমাবেশ, ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিল, ৩টায় বায়তুল মোকাররমে প্রাক্তন সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের সভা, শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ ও মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গমন। কৃষি উন্নয়ন কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, কচিকাঁচার মেলা, দোকান কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, বাংলা জাতীয় লীগ, জাতীয় কৃষক শ্রমিক দল, সংগীত কলেজ ও সংগীত একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশ, মিছিল ও গণসংগীতের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

২৩শে মার্চ : সকাল ৭টায় জাতীয় শ্রমিক লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচি শুরু। ছায়ানটের গণসংগীত, সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠির মৌচাক, মতিঝিল, বায়তুল মোকাররম ও সদরঘাট টার্মিনালে কবিতা পাঠ ও গণসংগীতের আসর, শেরে বাংলার মাজার জিয়ারত, বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক বিমান অফিসে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ও পিআইএ নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ বিমান' নামকরণ সমাবেশ ও মিছিল, পল্টনে ভাসানী ন্যাপের জনসভা ও মিছিল।

২৪শে মার্চ : লেখক সংগ্রাম শিবিরের ভবিষ্যৎ বাংলা শীর্ষক আলোচনা সভা, শহীদ মিনারে মুকুল মেলার সাহিত্য পাঠের আসর, ৫টায় টি এন্ড টি কলোনীতে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কর্মচারীদের সভা, পানি-বিদ্যুৎ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগীয় কর্মচারীদের সভা ও মিছিল।

২৫শে মার্চ : আদমজী হেড অফিস কর্মচারীদের সভা ও মিছিল, ভাসানী ন্যাপ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সভা, ৩টায় পল্টনে শ্রমিক ফেডারেশন ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের জনসভা, রাত সাড়ে ১১টায় গণহত্যা শুরু এবং তার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা ও বিডিআরের ওয়ারলেসযোগে তা চট্টগ্রামে প্রেরণ।

বস্তুত : ৮ মার্চ থেকেই ঢাকা নগরীর যে কোথাও যে কোন সমাবেশ হয়েছে, তার পরে সকলেই মিছিল সহকারে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির ৩২নং রোডের বাড়িতে গেছেন। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত এসব কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিলো। এবং কোন কোন দিন ৫০/৬০টি মিছিলও বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেছে। অবশেষে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র বাঙালির উপর অপারেশন সার্চলাইট নামক বিষয়টি প্রয়োগ হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার যুদ্ধ।

ভাষা আন্দোলনে মুজিবের ভূমিকা

মফিদা আকবর

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত ভাষা আন্দোলনই এ দেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচক। এ ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। যা অনেকে ভুলতে বসেছে। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে ভাষা বিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করেছিলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। (সূত্র : 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা' গাজীউল হক, ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি-১৯৯৪)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে তৎকালীন পূর্ববাংলায় প্রত্যাবর্তন করার পর সরাসরি ভাষা আন্দোলনে শরিক হন। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে তমুদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত কার্যক্রমে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

শেখ মুজিব কলকাতা ছেড়ে চলে এলেন স্বাধীন পাকিস্তানে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায়। ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। এখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন প্রথমে গণতান্ত্রিক যুবলীগ পরে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। এতে তিনি মুসলিম লীগের কোপানলে পড়েন। শেখ মুজিবের পূর্ব ধারণা সঠিক হল। পূর্ব বাংলার মানুষেরা এক অদৃশ্য যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে শুরু করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বুঝেছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা অধিক মাত্রায় অধিকার সচেতন। এদের কারণেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে। এদের ওপর শাসন-শোষণ চালাতে হলে এদের ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে হবে। সে জন্য প্রয়োজনে মুখের ভাষা কেড়ে নিতে হবে প্রথমে। এই ষড়যন্ত্র টের পান শেখ মুজিব। তাই নাজিমউদ্দিনের সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউজ বর্তমান বাংলা একাডেমীতে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা চলাকালে শেখ মুজিব রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রদের নিয়ে মিছিল সহকারে সেখানে উপস্থিত হন। এর পরে ১৯৪৮-এর ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য ১৯৫৩ সালে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে দেন।

১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পরপরই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানার যে ষড়যন্ত্র শুরু করে তারই অংশ হিসেবে তারা অফিস-আদালতে ইংরেজির পরিবর্তে উর্দুর প্রচলন শুরু করলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেন। তমুদ্দুন মজলিশ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনের আহ্বান জানায়। ১৯৪৭-এর শেষভাগে তমুদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে এ অধিবেশনে গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব দেন। খাজা নাজিমউদ্দিন এর বিরুদ্ধে একমাত্র উর্দুর স্বপক্ষে বক্তব্য দেন। ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্ররা এবং বুদ্ধিজীবী মহল তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্ররা শহরে মিছিল করে। এ বছরেই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আন্দোলন বেগবান হয়, এ আন্দোলনে মূলত তমুদ্দুন মজলিশ ও ছাত্রলীগই নেতৃত্ব দেয়। ২ মার্চ ফজলুল হক হলে সভা হয়। সভায় কামরুদ্দিন আহম্মদ আহ্বায়ক হন। এসময় উপস্থিত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, মুহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবুল কাশেম, রনেশ দাস গুপ্ত, অজিত গুহ প্রমুখ। ১১ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এদিন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একদল যুবক ও ছাত্ররা সচিবালয়ে হরতালের সমর্থনে পিকেটিং করাকালে অনেকের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন। প্রায় ৩০০ জন এসময় গ্রেফতার হলেও অনেককে ছেড়ে দেয়া হয়। শেখ মুজিবকে জেলে প্রেরণ করা হয়।

ইতোমধ্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফর চূড়ান্ত হলে খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারটি ছাত্রদের সাথে মীমাংসা করতে চাইলে ছাত্র নেতৃবৃন্দ জেলে আটক শেখ মুজিবের সাথে কয়েক দফা আলোচনা করে খাজা নাজিমউদ্দিনের সাথে ৮ দফা চুক্তি সম্পাদন করে। এ চুক্তির ফলে ১৫ মার্চ শেখ মুজিবসহ আটক ছাত্ররা মুক্তি লাভ করে। পরের দিন শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা হয় এবং সভা শেষে তার নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ও খাজা নাজিমউদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল হয়। এ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করায় ১৯ জন গুরুতর জখম হয়। ফলে পরদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবাদ ধর্মঘট হয়।

১৯ মার্চ জিন্নাহ ও তার বোন ফাতেমা জিন্নাহ ঢাকা পৌঁছেন। ২০ মার্চ রমনা রেসকোর্সের বিশাল সভায় জিন্নাহ ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের

রাষ্ট্রভাষা। এরই মধ্য থেকে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিনের ইঙ্গিতে ছাত্ররা হাত নেড়ে না, না বলে প্রতিবাদ জানায়। ২৪ মার্চ কার্জন হলে সমাবর্তন সভায় জিন্নাহ পুনরায় ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সভায় উপস্থিত ছাত্ররা তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিবাদ জানায়। জিন্নাহ ঢাকা ত্যাগ করার পর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়। জিন্নাহ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সোহরাওয়ার্দীর শান্তি মিশনে থাকার সুযোগে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে রাষ্ট্রপতি, তোফাজ্জল আলীকে ডেপুটি স্পীকার ও ডাঃ মোত্তালেবকে মন্ত্রী নিয়োগ করায় গড়ে ওঠা মুসলিম লীগ বিরোধী শিবিরের কর্মকাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। সব স্তিমিত হলেও শেখ মুজিবের সাংগঠনিক দক্ষতা স্তিমিত হয়নি। তিনি ১৯৪৮-এর ৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভা অনুষ্ঠান করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ গঠন করেন, সভাপতি করেন আবদুর রহমান চৌধুরীকে।

১৯৪৮ সালের ৮ জানুয়ারি ছাত্রলীগ মুসলিম সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করে। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। যার আয়োজনে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দেন।

বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িকতা মুক্ত রাজনীতি

মফিদা আকবর

বঙ্গবন্ধু তার সমগ্র জীবন চিন্তা-ভাবনা ও শ্রম উৎসর্গ করেছিলেন এ দেশের জন্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন আদর্শবাদী ও নীতিবান হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। জীবনে কখনো নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনায় আনেননি। সকল সময় চিন্তা এবং চেতনায় ছিল বাংলা ও বাঙালিদের নিয়ে। বাঙালিদের মুখে কি করে হাসি ফোটানো যায়, এ একটি বিষয়ই সবসময় তাকে বিচলিত করতো। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি রাজনীতি করেছেন এবং কখনোই কোন বিষয়ে তিনি ছাড় দেননি। যখনই বাংলার জনগণের অধিকার বিষয়টি তার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তখনই তিনি অনমনীয় হয়ে যেতেন এবং তখন যদি তার সাথে কেউ নাও থাকতো তবুও তিনি হাল ছাড়তেন না। একরকম দৃঢ়তার সাথে তিনি সেই হাল ধরতেন। তিনি কখনোই আপসকামী ছিলেন না। এ রকম ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়াকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ছেড়ে যাওয়া সোহরাওয়ার্দীর বিরোধী দলে অবস্থান নেয়া এবং বিশেষ করে ইস্কান্দার মির্জার ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবের ভেতরটাকে প্রচণ্ড ঝাঁকি দেয়, তিনি বুঝতে পারেন একটি দল বা সংগঠনের সর্বদাই মিলিত মতামতই একটি আদর্শ রাজনৈতিক শক্তিরূপে প্রদর্শন করা যায়। একক কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে কোন বৃহৎ রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রিক কাঠামো তৈরি করা যায় না। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যেতে হলে সর্বদাই প্রয়োজন সকল ধর্ম-বর্ণের নাগরিকের সমঝোতা। অর্থাৎ সকল ধর্মের নাগরিকের সমান সমান কর্মকাণ্ড। এখানে একটি ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ার কোন অবকাশ নেই। আর এভাবেই একটি রাজনৈতিক দলের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দেশের জন্যও বৃহৎ কল্যাণ বয়ে আনা যায়, এই উপলব্ধি থেকেই শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর সাথে আলোচনা করে আওয়ামী মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রের উদ্যোগ নেন। ১৯৫৫ সালের ২১-২২-২৩ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। সারা পূর্ব বাংলা থেকে ৭০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

অধিবেশনের প্রথম দিনেই আওয়ামী মুসলিম লীগের সংবিধান পরিবর্তন করে দলটির অসাম্প্রদায়িক রূপ দেয়া এবং মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়ার ব্যাপারটি অনুমোদিত হয়। অসাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাজনীতির শুরু হয় তখন থেকেই। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দলীয় কর্মকাণ্ডে জোরালো ভূমিকা রেখে দলকে পশ্চাৎপদতামুক্ত করে এগিয়ে নিচ্ছিলেন।

মুজিবের ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি

মফিদা আকবর

বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ আর মুক্তিযুদ্ধের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যার নামটি জড়িয়ে আছে, তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আপামর বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য, এ বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি আর কেউ নন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলা এবং বাঙালিদের পশ্চিমাদের কোপানল থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি যে সংগ্রাম-আন্দোলন শুরু করেছিলেন এর একটি অন্যতম কর্মসূচি ছিল মুজিবের ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সর্বস্তরের বাংলার মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অধিকার বিষয়টিকে মাথায় রেখে ছয় দফার রূপরেখাটি তিনি বাংলার জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং জনগণকে এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও বোঝানোর চেষ্টা করেন।

শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার জনগণের উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬-দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করেছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালেরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এ চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-চৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব পাক জনগণের মুক্তি সনদ, একুশ দফা দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী, যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবী, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্পব্যয়ে শিক্ষালাভের দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যে এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।'

'আমার প্রস্তাবিত ছয় দফা দাবীতেও এরা তেমনিভাবে পাকিস্তানকে দুই টুকরা করিবার দূরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবীতে পূর্বপাকিস্তানের সাড়ে পাঁচকোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদ ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণির সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬ দফা দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে।'

কিন্তু এও 'আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাদের বিত্ত প্রচুর। হাতিয়ার এদের অফুরন্ত, মুখ এদের দশটা, গলার সুর এদের শতাধিক, এরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এরা আছেন সরকারি দলে।

আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় এরা সকলে একজোট। এরা নানা ছলাকলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গেছে। পূর্বপাকিস্তানবাসী নিষ্কাম সেবার জন্য এরা ইতিমধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবে না। তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬ দফা দাবীর তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা বিশেষত আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি তারা সকলে অবিলম্বে ৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফাওয়ারী সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রকাশ করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মিগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্বপাকিস্তানী মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।'

সংক্ষেপে ছয় দফা নিম্নরূপ :

১। পাকিস্তান হইবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্র সংঘ। সেভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হইবে।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি থাকিবে।

৩। দুটি পৃথক অথচ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকিবে অথবা এই মুদ্রা এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে চালান হইতে পারিবে না।

৪। ফেডারেশনভুক্ত অঙ্গ রাজ্যগুলির কাছে কর, শুল্ক ধার্য ও আদায় করিবার ক্ষমতা থাকিবে তবে, কেন্দ্র সরকারের খরচের একটি অংশ পাইতে পারে। অঙ্গ রাজ্যগুলি হইতে সমহারে এই কর পাইবে।

৫। (ক) প্রতিটি ফেডারেশনভুক্ত রাজ্যের বহিঃবাণিজ্য স্ব-স্ব এখতিয়ারে করিতে হইবে।
(খ) বহিঃবাণিজ্যে অর্জিত অর্থে রাষ্ট্রগুলির এখতিয়ার থাকিবে।
(গ) অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ কেন্দ্রের জন্য সমহারে বৈদেশিক মুদ্রা মিটাইবে।
(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্ব-স্ব সমাজে দ্রব্য বাণিজ্যে কোন শুল্ক বা কর বাধা থাকিবে না।
(ঙ) অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ বিদেশে স্ব-স্ব বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে ও স্ব-স্বার্থে বাণিজ্য চুক্তি করিতে পারিবে।
৬। আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর স্ব-স্ব সামরিক বা আধাসামরিক বাহিনী গঠন ও রাখার শাসনতান্ত্রিক অধিকার দিতে হইবে।

১৯৬৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে ৬ দফা গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়। ৬ দফা পুস্তিকাকারে ২১ ফেব্রুয়ারি বিলি করা হয়। ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগে দ্বিধাবিভক্তির আশংকা দেখা দেয়। মোনায়েম খান ৬ দফার আন্দোলনকারীদের কঠোরহস্তে দমনের ঘোষণা দেন। এই ছয় দফাই একদিন বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র মন্ত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং স্বাধীনতা অর্জনে একান্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিব

মফিদা আকবর

একজন বিশাল মাপের মানবতাবাদী হিসেবে শেখ মুজিব বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসেবে যে নিজেকে তৈরি করছিলেন এবং তৈরি হচ্ছিলেন তা তার ছয় দফা কর্মসূচির মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। এ ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে রাজনীতিবিদদের মধ্যে যে বিভাজন দেখা দিয়েছিল তাকে আবার একই কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার সাহস, দৃঢ়তা ও পারঙ্গমতা ছিল একমাত্র শেখ মুজিবেরই।

যে ছয় দফা বাংলার মানুষের প্রাণের দাবি সে ছয় দফা নিয়ে আওয়ামী লীগের ভেতরেই দেখা দেয় অসন্তোষ। ছয় দফাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা তর্কবাগিশসহ কিছুসংখ্যক নেতা প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। এসব প্রবল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফার অনুমোদন হয়। ১৮ এবং ১৯ মার্চ ঢাকা ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে ছয় দফা অনুমোদিত হয় এবং সেদিন কাউন্সিলরগণের সিদ্ধান্তক্রমে শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি করে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। শেখ মুজিব দলের সভাপতি হয়ে পূর্ব বাংলার সুবিধা-অসুবিধাগুলো বিবেচনা করে দলীয় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করেন। সময়ের তাগিদে এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সীমাহীন দুর্নীতি এবং পূর্ব বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি সংগ্রাম-আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। জেল-জুলুম উপেক্ষা করে পূর্ব বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করার জন্য তিনি তার কার্যক্রম চালিয়ে যান। শেখ মুজিব আওয়ামী কর্মীদের সবসময় কঠোর নির্দেশ প্রদান করতেন যেন বিনা দ্বিধায় দেশ মাতৃকার জন্য জীবন বাজি রাখার প্রস্তুতি রাখে। কারণ সে সময় জীবনের ওপর হুমকি ছিল সব সময় মুজিবের। মুজিব নিয়মতান্ত্রিক ও গঠনমূলক আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন। সবসময় দেশের কল্যাণের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যেতেন তিনি। নিজের জীবনের সুখ-সুবিধার কথা কখনো ভাবেননি। যার ফলশ্রুতিতে সংগ্রাম-আন্দোলনে তিনি ছিলেন সর্বদা সোচ্চার। মুজিবের অনঢ়, একাগ্রতায় লড়াই-সংগ্রাম বেগমান গতিশীল করেছিলেন, যে কারণে তৈরি হতে পেরেছিল আজকের বাংলাদেশ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

মফিদা আকবর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উত্তেজনার মাত্রা বাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী তার মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের দাবি তিনি জলদগম্ভীর স্বরে তুলে ধরতেন। এর জন্য রাজদণ্ডের ব্যবস্থাপত্রের সাথে সাথে তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বরাবর বিনাশের আয়োজন করা হয়েছে একাধিকবার। বার বার জেলে নিয়ে অত্যাচার করার পাশাপাশি তাকে হত্যার জন্য চেষ্টা করেছিল- তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক জান্তা। আগরতলা মামলায় দেশদ্রোহী বলে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলন কর্মসূচিকে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, বাঙালি সেই শক্তি আয়ত্ত করে প্রত্যাঘাত হেনে তার মৃত্যুর চক্রান্তকে প্রতিহত করে।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি ছিল মূলত পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। বাঙালির অনেকদিনের লালিত স্বপ্ন ছয় দফা কেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসনকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার জন্য আইয়ুব খান ষড়যন্ত্র শুরু করেন। আইয়ুব খান শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করেন। এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলাই পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা নামে ব্যাপক পরিচিতি পায়। এই মামলার অভিযোগে বলা হয় এক নম্বর আসামি শেখ মুজিব ভারতের সাহায্য নিয়ে সশস্ত্র পন্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন করার লক্ষ্যে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আরও বলা হয়, শেখ মুজিব ও তার সহযোগীরা ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন এবং ভারতীয় ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। সরকারি এসব ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ১৯ জানুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট আহ্বান করে।

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ শেখ মুজিবের প্রকাশ্যে বিচার দাবি করা হয়। এভাবে শাসক

গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও দমননীতির অত্যাচারে পীড়িত হয়ে বাংলার মানুষ তখন যে ছয় দফা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সে আন্দোলন আরো তীব্রতর রূপ আকার ধারণ করে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সরকারের এ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জন্য। আর এই তীব্র আন্দোলনের ফলেই আগরতলা মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই গণআন্দোলনের চাপে সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। তাই বিনাশর্তে শেখ মুজিবসহ অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মুক্তি পেয়ে যান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

মফিদা আকবর

৬ দফার আন্দোলন ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী যে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের গ্রহণযোগ্যতা সমগ্র দেশব্যাপী দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় মওলানা ভাসানী আইয়ুবকে সমর্থন করতে থাকলেও পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে ১৯৬৮ সালের ৩ নভেম্বর আইয়ুবের পদত্যাগ দাবি করেন। ১৯৬৯ নভেম্বর ঢাকার আইনজীবীরা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মিছিল করেন এবং বায়তুল মোকাররমে সভা করেন। ছাত্ররা দেশব্যাপী প্রতিরোধ দিবস পালন করে। ৭ নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলি করলে আবদুল হামিদ নামে এক ছাত্র নিহত হয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৩ নভেম্বর জুলফিকার আলী ভুট্টোকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ২৯ নভেম্বর পূর্ব বাংলায় ছাত্রসমাজের মিছিল ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালের ৮ ডিসেম্বর সারা পাকিস্তানে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ১ ডিসেম্বর সাংবাদিকরা ঢাকায় মিছিল করে সরকারি দমননীতির প্রতিবাদ জানান। ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। পুলিশের গুলিতে এদিন ৩ জন নিহত হয়। ১৩ ডিসেম্বর প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান করা হলে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে কিন্তু জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সারাদেশে হরতাল পালন করে।

১৯৬৮ সনের ১৮ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সকল বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালে ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহম্মদ তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেন।

গণআন্দোলন আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনে দেশে ঐকমত্যের রাজনীতি গতি পায়। ১৯৬৯-এর ৫ জানুয়ারি ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও এনএসএফ-এর একটি অংশ ১১ দফা দাবিতে

ঐকমত্য পোষণ করে কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের আহ্বায়ক হন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ।

১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি এক নায়কতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে ৮ দফা দাবিতে উবসড়পৎধঃরপ অপঃরড়হ ঈড়সসরঃঃবব (উঅঈ) বা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি পিডিএম-এর নেতৃত্বে ৫টি বিরোধী দল ঐকমত্যের ভিত্তিতে ন্যূনতম কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ৮ জানুয়ারি ৫ দফা দাবি ঘোষণা করে। এই ৫ দফা এবং ডাক-এর ৮ দফা সর্বত্র সংবর্ধিত হয়। ৯ জানুয়ারি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ডাক ১৭ জানুয়ারি দাবি দিবস পালন করে। ঐদিন ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করলে পুলিশ অনেককে গ্রেফতার করে। জনতা ও নেতৃবৃন্দ মৌন মিছিল করে ঢাকা বার লাইব্রেরিতে সভা অনুষ্ঠান করে।

১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট আহ্বান করে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে কাঁদানে গ্যাস ছোটড়ে। পুলিশ ও ইপিআর হল আক্রমণ করে ছাত্রদের ওপর নির্যাতন চালায়। শিক্ষক সমিতি এর প্রতিবাদ জানায়। ১৯ জানুয়ারি দু'জন ছাত্র গ্রেফতার হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটে ছাত্র ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ মিছিল চলে।

২০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সমবেত হয়। এ দিন পুলিশের গুলিতে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও সেন্ট্রাল ল' কলেজের ছাত্র এ এম আসাদুজ্জামান নিহত হয়। এদিনটি তাই আসাদ দিবস। এদিন একজন সাংবাদিকসহ ৪ জন নিহত হয়। আসাদের মৃত্যু ছাত্র আন্দোলনকে আপসহীন গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করে। এদিন করাচিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সেখানেও পুলিশের গুলিতে ৬ জন নিহত হয়।

ছাত্রদের ১১ দফা মূলত আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল। ১৯৬৯-এর ১৪ জানুয়ারি ছাত্রদের সাধারণ সভায় ১১ দফার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নামে। পুলিশি বাধায় আসাদের লাশ নিয়ে মিছিল করা সম্ভব হয়নি। হাইকোর্ট বার আসাদের হত্যা ও ছাত্র-জনতার ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানায়। ছাত্র-জনতা মেডিকেল কলেজের সামনে শোকসভা করে ২১ জানুয়ারি হরতাল ঘোষণা করে। ঐদিন পল্টনে আসাদের গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে জনতা নগ্নপদে মৌন মিছিল করে। ২১, ২৩ ও ২৪ তিনদিন শোক দিবসের ঘোষণা দেয় ছাত্র সংগ্রাম

পরিষদ। ২২ জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, কালো ব্যাজ ধারণ ও কালো পতাকা উত্তোলন এবং দুপুরে কলাভবনে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও বটতলা হতে মশাল মিছিল বের হয়। ২৪ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ২৪ জানুয়ারি হরতাল চলাকালে ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান মল্লিক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এছাড়াও মকবুল, রুস্তম ও নাম না জানা আরো একজন নিহত হয়। জনতা মকবুল, রুস্তমদের লাশ ছিনিয়ে নিয়ে মিছিল করে। জনতা সরকারি প্রেস ট্রাস্ট পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। সরকার রাত ৮টায় ২৪ ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারি করে। ২৫ জানুয়ারি কারফিউ ভঙ্গ করে জঙ্গী মিছিল বের হলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালালে অনেকে হতাহত হয়। এ সময় স্তন্যদানরত সন্তান কোলে আনোয়ারা বেগম নিহত হয়। পলিটেকনিকের ছাত্র আব্দুল লতিফও নিহত হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৬ জানুয়ারি থেকে তিনদিনের শোক দিবস পালন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে জেলা, মহকুমা, থানা, গ্রাম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের উদ্যোগে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ মেনে চলা এ সব কর্মসূচি ঘোষণা করে গণআন্দোলন-সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বাধীন নিয়ে নেয়। ২৬ জানুয়ারি ডেমরা, নারায়ণগঞ্জ জেলায় পুলিশ ও সৈন্যদের গুলিতে ৪ জন নিহত হয় ও ১৬ জন আহত হয়। প্রতিদিন মিছিল ও প্রতিবাদ চলতে থাকে। ২৭ থেকে ৩১ জানুয়ারি লাগাতার আন্দোলন চলে। ৩১ জানুয়ারি ঢাকা থেকে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়। এ আন্দোলন গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। আইয়ুবের সমর্থক মৌলিক গণতন্ত্রীরা আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে থাকে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে আইয়ুব শাহী সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিলেও আন্দোলনের অগ্নিশিখা আরো লেলিহান হয়ে জ্বলতে থাকে। দেশের বুদ্ধিজীবী মহল, কবি, সাহিত্যিক, নাঁ্যকার, গবেষক, গায়ক, শিক্ষক, আইনজীবীসহ সকল পেশাজীবী মহল আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে একাত্মতা ঘোষণা করে। সরকারি কর্মচারীরাও আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। ফলে আইয়ুব বুঝতে পারে তার দিন শেষ। তিনি পালানোর পথ খুঁজতে থাকেন। তিনি বিরোধী দলের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন।

আইয়ুব খান ১৭ ফেব্রুয়ারি গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন এবং ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসেন। ঐদিন ছাত্ররা ঢাকায় কালো দিবস পালন করে। তিনি ঘোষণা করেন যদি মুজিব ও ভুট্টো আলোচনায় বসতে রাজি হয় তবে জরুরি আইন

প্রত্যাহার করা হবে। আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত নেয় তাদের দাবি মানা না হলে তারা আলোচনায় বসবে না। ৮ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান জনগণের চাহিদামত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ঘোষণা দেন। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ঘোষণা দেন ১১ দফা মানা না হলে আন্দোলন চলবে।

৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক-এর ছাপাখানা নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রত্যাহার হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় জনতার বৃহত্তর মিছিল বের হয়। তারা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে সমবেত হয়ে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করে। আওয়ামী লীগ ও ছাত্র-জনতা সিদ্ধান্ত নেয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া গোলটেবিল বৈঠক বসতে পারে না। এ সময় অনেক নেতা প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যাবার অনুরোধ করলেও কারো কারো পরামর্শে ও শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেছার পরামর্শে শেখ মুজিবুর রহমান বন্দী অবস্থায় গোলটেবিল বৈঠকে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

১২ ফেব্রুয়ারি জনতার দাবি আদায়ের পূর্বে আইয়ুবের সাথে বৈঠক থেকে বিরত থাকতে বলে। ঐদিন বিরোধীদলের কয়েকজন সদস্য ইস্তফা দেন এবং তাজউদ্দিনসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা মুক্তি পান। এদিনই ৭ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি সরকার ঘোষণা করে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে জরুরি আইন প্রত্যাহার করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে সরকার ১৪ ফেব্রুয়ারি ভুট্টোকে মুক্তি দেয়। ঐদিন ডাক ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৮ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার সমর্থনে দেশব্যাপী হরতাল ও বিকেলে পল্টনে জনসভা আহ্বান করে। এ সভায় পিডিএম নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দিতে না পারায় আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের হাতে চলে যায়। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি বাঙালিদের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সেনা ছাউনিতে ক্যাম্পের বাইরে শেখ মুজিব পাঁয়চারি করছিলেন এমন সময় একজন পাঞ্জাবি সৈনিক দ্রুত তাকে তার নিজ কক্ষে চলে যেতে বলেন এবং জানান যে তাকে গুলি করা হতে পারে। শেখ মুজিব দ্রুত নিজ কক্ষে চলে গেলে সমূহ মৃত্যু থেকে বেঁচে যান।

পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে টয়লেটে যাওয়ার সময় সকাল ৬ টায় বিনা উসকানিতে গুলি করা হয় এবং বেয়নেট চার্জ করে সার্জেন্ট

জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি হাবিলদার মঞ্জুর হোসেন শাহ ঠাণ্ডা মাথায় ওপরের নির্দেশে এ কাজ করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে ফজলুল হক বেঁচে যান কিন্তু জহুরুল হক মারা যান। আগরতলা মামলার ৩৫ জন আসামির মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ১ নম্বর। এদের মধ্যে ৫ জনকে হত্যা করা হয় যার মধ্যে সার্জেন্ট জহুরুল হকই ছিলেন প্রথম।

সার্জেন্ট জহুরুল হকের লাশ ১৬ ফেব্রুয়ারি তার ভাই এ্যাডভোকেট আমিনুল হকের বাসায় আনা হলে হাজার হাজার লোক সুশৃঙ্খলভাবে তাকে জাতীয় বীর হিসেবে শেষ শ্রদ্ধা জানায়। ২.৩০ মিঃ-এ পল্টনে জানাজা হয়। জানাযায় লক্ষাধিক লোক লাশ নিয়ে শোক মিছিল করে ৩.৩০ মিঃ আজিমপুর গোরস্তানে তাকে দাফন করে। এই মৃত্যু গণআন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে নিয়ে যায়। জনতার মধ্যে প্রতিহিংসা ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী জনতা আইয়ুবের প্রচার যন্ত্র ও দালালদের ওপর আক্রমণ চালায়। জনতা মারমুখী হলে পুলিশ লাঠিজার্চ করে ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। জনতা সবকিছু উপেক্ষা করে মন্ত্রী ও কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতাদের বাড়ি আক্রমণ করতে থাকে। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে জনতা তা ভঙ্গ করে মিছিল করে। পল্টনে বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা করে দু'মাসের মধ্যে ১১ দফা না মানলে খাজনা বন্ধ করে দেয়া হবে। ইতোমধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি জরুরি আইন প্রত্যাহার করে গোল টেবিল বৈঠক ১৯ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। রাজশাহীতে এদিন ১৪৪ ধারা জারি হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ ও মেডিকেলের ছাত্ররা জনতাদের নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। এদিন ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে জনসংযোগ কর্মকর্তা গ্রামে পালিয়ে গেলে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না মর্মে গুজব রটলে মোনায়েম সেনা প্রয়োগ করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় গেটে ছাত্রদের সাথে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। রসায়নের শিক্ষক ড. সামছুজ্জোহাসহ শিক্ষকগণ শান্তি ফিরিয়ে আনতে গেটে যান। এ সময় সেনাদের নিয়ন্ত্রণে ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নাসিম ছিলেন কিন্তু তার নির্দেশ ছাড়াই পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেনের আদেশে ড. সামছুজ্জোহাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে গুলি তার বক্ষ বিদীর্ণ করে। অন্যান্য শিক্ষককেও গ্রেফতার করা হয়। বেলা ৩টায় ড. জোহা মৃত্যুবরণ করেন। ড. জোহার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষকগণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট করে। সারা পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাজশাহীতে কারফিউ জারি হয়। জনগণ কারফিউ ভেঙ্গে শোক মিছিল করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি কারফিউ ভেঙ্গে সেনা, পুলিশ ও ইপিআরের সাথে ছাত্র-জনতা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে ২০ জন ছাড়াও কুষ্টিয়া ও নোয়াখালীতে ৪ জন নিহত

হয়। ড. জোহা হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন থানা ও গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়ে। আজও বাঙালিরা ১৮ ফেব্রুয়ারি শহীদ জোহা দিবস পালন করে। ১৯৬৯-এর একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসের পাশাপাশি সামরিক শাসন ও আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এদিন আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস এ রহমানের বাড়িতে জনতা অগ্নিসংযোগ করে। ফলে তিনি এক কাপড়ে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে চলে যান। এদিনও ১৯৫২'র ২১ ফেব্রুয়ারির মত জনতার ওপর গুলি চালানো হলে খুলনায় ১ জন এবং পাবনায় ২ জন শহীদ হয়। এদিন আইয়ুব ঘোষণা করেন তিনি পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না।

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন এবং স্বাধীনতার প্রস্তুতি

মফিদা আকবর

'৭১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পর ইয়াহিয়া খান ভালভাবেই বুঝতে পারেন পূর্ব বাংলাকে আর উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে মিলিত হয়ে নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে ১লা মার্চ বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরকারি কর্মচারীরা অফিস-আদালত ছেড়ে রাজপথে নেমে আসে। ঢাকা স্টেডিয়ামের ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে যায়। দর্শকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাঠিসোঁটা, হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে উন্মত্ত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

ইয়াহিয়া খানের স্বৈরাচারী ঘোষণা প্রতিহত করার জন্য ছাত্রলীগ ও ডাকসুর উদ্যোগে জহুরুল হক হলে ১লা মার্চ গঠিত হয় "স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ"। ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ডাকসুর ভি,পি আ,স,ম আব্দুর রব, জি,এস, আব্দুল কুদ্দুস মাখন "স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ চার ছাত্রনেতা স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চার খলিফা বলে পরিচিত। ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের প্রতিবাদে ১লা মার্চ বিকেলে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বিরাট ছাত্র গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এবং সভাস্থল থেকে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।

২রা মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনের সামনে স্মরণকালের বৃহত্তম ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে। এ সমাবেশে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক এম, এ রশিদ। ২রা মার্চ ছাত্র গণসমাবেশে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন ছাত্রলীগ নেতা ডাকসু ভি,পি আ,স,ম আব্দুর রব। ৩রা মার্চ ছাত্রলীগের

জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ। ৩রা মার্চ থেকে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের যৌথ নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। সারাদেশে সান্ধ্য আইন জারি হয়। ছাত্র-জনতা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল করতে থাকে। ৩রা ও ৪ঠা মার্চ ঢাকায় ২৩ জন নিহত ও তিনশতজনের বেশি আহত হয় এবং চট্টগ্রামে একুশজন নিহত হয় ও অগণিত মানুষ আহত হয়। ৫ই মার্চ শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে টঙ্গি শিল্প এলাকায় ৪জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। এ খবর ঢাকা এসে পৌঁছলে ছাত্রসমাজ উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক বিরাট মিছিল বের হয়। এদিন ঢাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আওয়ামী লীগ অফিসে একটা কন্ট্রোল রুম খোলা হয়। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ৭ই মার্চের জনসভা সফল করতে ছাত্রলীগ অনন্য ভূমিকা পালন করে। ১০ই মার্চ ছাত্রলীগের চার খলিফা "চট্টগ্রাম বন্দরে এম,এন সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর ঘটনা সম্পর্কে জনগণকে এক বিবৃতির মাধ্যমে সতর্ক করে দেন এবং সেনাবাহিনীকে কোনরকম সাহায্য-সহযোগিতা না করতে আহবান জানানো হয়। ১৩ই মার্চ সকাল বেলা রমনা পার্কে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই মার্চ সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে লালবাগ বালুর মাঠে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের চারজন নেতা এবং ১৫ই মার্চ "স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে এক বিশাল ছাত্র গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় ছাত্রলীগের চার নেতা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, আজ বাংলাদেশ স্বাধীন। আমাদের উপর কারোর সামরিক আইন জারি করার ক্ষমতা নাই।" বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশের একমাত্র সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই নির্দেশ জারি করতে পারবেন। বাংলাদেশ কেবলমাত্র তার নির্দেশ মানবে, অন্য কারো নির্দেশ মানবে না। ১৭ই মার্চ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানসহ বিভিন্ন এলাকায় কুচকাওয়াজ ও রাইফেল পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে শুরু করেন। স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩শে মার্চকে পাকিস্তান প্রতিরোধ দিবস ঘোষণা করে এবং প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে ২৩ শে মার্চ সকাল ৬টায় সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত, শিক্ষা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এবং সকল প্রকার যানবাহনে স্বাধীন

বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরীর শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এবং এদিন ছাত্রলীগের চার নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, আ, স, ম আব্দুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, শাহজাহান সিরাজ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় 'জয়বাংলা বাহিনীর গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করেন এবং সালাম গ্রহণ করেন। এবং জয়বাংলা বাহিনীর পাঁচশত সদস্য প্যারেড করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যায়। এবং সেখানে তারা বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধুকে সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানান। এভাবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করে।

স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু

মফিদা আকবর

ইতিহাসের নিরিখে স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষক বঙ্গবন্ধুই। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন– সেই ভাষণের মধ্যে তিনি বলেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'– ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত এই ভাষণকে শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে উল্লেখ করে হাইকোর্ট সম্প্রতি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে পরিস্থিতিতে যেভাবে এই অবিস্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন, তার কোন তুলনা ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় না। রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন। রায়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়েছে। বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদকে নিয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় প্রদান করেন।

হাইকোর্টের সেই ঐতিহাসিক রায়ে বলা হয়েছে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত থেকে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহর পর্যন্ত বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছে গিয়েছিল। এই ঘোষণা সংবিধানে প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যা পরে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে অমরতা প্রদান করা হয়েছে।

রায়ে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ দুপুর থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত হান্নান, বেলাল মোহাম্মদ, জিয়াউর রহমানসহ সকলের ঘোষণা একজনের পক্ষেই ছিল। যিনি ২৬ বছর ধরে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় কারাবন্দি থেকেছেন। ১৯৬৬ সালে মুক্তির সনদ ছয় দফার মত বিপ্লবী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি বাঙালি জাতির চিন্তা-

চেতনাকে সার্থকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বাঙালি জাতির গর্ব। তিনি জাতির পিতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। বন্দি অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে তার জীবনাশংকা ছিল। কিন্তু সেই বাঙালি জাতি আত্মমর্যাদা ও সাহসের সঙ্গে 'জয়বাংলা' স্লোগান তুলে অবিসংবাদিত সিপাহসালার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে যুদ্ধ করে লক্ষ লক্ষ লোক মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছিল। তিনি ছিলেন তাদের একমাত্র নেতা। তিনি হলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

এছাড়া ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ লন্ডনস্থ প্রথিতযশা সংবাদপত্র 'দি টাইমস', 'দি ফিনান্সিয়াল টাইমস'-এ প্রকাশিত শিরোনামে, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয় যে, গ্রেফতারের পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন।

৭ই মার্চের ভাষণটিই মূলত স্বাধীনতার ঘোষণা এবং এম এ হান্নান যে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেছিলেন সেটাও শেখ মুজিবের নির্দেশেই করেছিলেন। সুতরাং ইতিহাস নিরীক্ষণ করে বলা যায় প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস

মফিদা আকবর

অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের পর সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঐ নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। যা পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু বাস্তবে এটাই ছিল সত্য। এই সত্যকে পশ্চিমারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। এই সত্যকে উপেক্ষা করে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। জনপ্রতিনিধি মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নিজেরা ক্ষমতার শীর্ষে থাকার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ইয়াহিয়া এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো একের পর এক বৈঠক করেন বাংলার জনপ্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। কিন্তু বৈঠকের পর বৈঠক অমীমাংসিত থেকে যায়– তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করে না। পশ্চিমাদের তালবাহানার প্রক্রিয়া মুজিবের মনে সন্দেহের বীজ রোপিত হয়। তিনি '৭১-এর ৩ মার্চ থেকে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশ দেন। তখন থেকে দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি সেক্টরে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তার জীবনের এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এ দেশের বাঙালিদের উদ্দেশ্যে। এই ভাষণেই তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা আছে তা নিয়েই প্রস্তুত থাকো। আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি– যার যা আছে তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বে। স্বাধীনতার পুরো রূপরেখাই সেদিন ৭ মার্চের ভাষণে প্রতিভাত হয়েছিল, মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণে পশ্চিমারাও আঁচ করতে পেরেছিল– কি হতে যাচ্ছে। এরপরও পশ্চিমারা বাঙালিদের শোষণ করার জন্য কূটচাল চালিয়েই যেতে থাকলো। আর বাংলার জনগণকে এবং বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেয়ার জন্য একের পর এক বৈঠক করে যেতে লাগলো। এই বিষয়টি ছিল ওদের প্রতারণার সামিল। মুজিবকে কি করে বিশ্বের কাছে দোষী সাব্যস্ত করা যায় এরকম একটি পথও তারা খুঁজছিল। এভাবে কালক্ষেপণ করে করে ২৫ মার্চ '৭১-এর মধ্য রাত্রিতে ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায় ওরা। পিলখানা, রাজারবাগ থানাসহ ঢাকার

উল্লেখযোগ্য স্থানে শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং নির্বিচারে বাঙালিদের হত্যা করা হয়। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলীর নির্দেশে এভাবেই সেদিন এই দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

ক্রমেই সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এ দেশের বাঙালি জনগণ এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছিল তখন। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে পাক হানাদাররা। পাক হানাদারদের সহযোগিতা করে এ দেশেরই কিছু কুসন্তান। একাত্তরের ২৫ মার্চের কালোরাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যখন ঘুমন্ত, নিরস্ত্র বাঙালির উপর 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক অভিযান চালায় তখন কিছুসংখ্যক ঘৃণ্য মানুষ এখন যারা মানবতাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তারা অত্যন্ত খুশী হয়। এরই প্রেক্ষিতে চারদিন পর গোলাম আযমসহ কয়েকটি দলের নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করেন। বাঙালির উপর তারা সামরিক অভিযান চালানোয় সন্তোষ প্রকাশ করে অনুরোধ করেন টিক্কাখানকে যেন শিঘ্র তারা শান্তি কমিটি এবং নাগরিক কমিটি গঠন করে। পরে খাজা খয়ের উদ্দিনকে আহ্বায়ক করে ১৪০ সদস্যের শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকে ছয়জনের উপর। উক্ত ছয় সদস্যের মধ্যে গোলাম আযমের স্থান ছিল দুই নম্বরে।

পরবর্তীতে গোলাম আযমের তত্ত্বাবধানে শান্তি কমিটিকে আরো বিস্তৃত করে আরো কয়েকটি শাখা কমিটি গঠন করা হয়। ঐসব কমিটির নামকরণ হয় রাজাকার বাহিনী, মুজাহিদ বাহিনী, আলবদর, আলশামস বাহিনী। সারাদেশ জুড়ে এসব বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করা হয়। এসব বাহিনীর প্রতিনিধিগণ যেহেতু এদেশেরই সন্তান আর মুক্তিযোদ্ধারা এবং এ দেশের সাধারণ মানুষরাও যেহেতু এদেশেরই সন্তান। তাই তারা কে কি করে, কোথায় থাকে, সবাই সবাইকে জানে। পাক বাহিনীরা যেহেতু এদেশের সন্তান নয় তারা জানে না কে মুক্তিযোদ্ধা এবং আওয়ামী লীগারের প্রতিনিধি এবং কে আওয়ামী লীগার, কে হিন্দু। গোলাম আযমদের সদস্যগণ এদেশীয় বলে আর সবাইকে চিনে বলে পাক হানাদারদের হাতে সহজে ধরিয়ে দিতো এবং নৃশংসভাবে মেরে ফেলতো মুক্তিযোদ্ধাদের এবং নিরপরাধ যাদের যাদের তারা সন্দেহ করতো তাদেরও। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এরা পাক বাহিনীদের সাথে একাত্ম হয়ে সারা বাংলাদেশকে তছনছ করে ফেলেছে। রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে রাজপথ। এহেন অপকর্ম নেই যে এই নয় মাসে তারা করেনি। ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের যে নৃশংস কায়দায় হত্যা করা হয়– এটাও ছিল

গোলাম আযমের মস্তিষ্কপ্রসূত কাজ। উল্লেখিত রাজাকার, আলবদররা পাক বাহিনীদের সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়। তারা আওয়ামী লীগের নেতাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সংখ্যালঘুদের চিহ্নিত করে দেয়া, বাংলাদেশের অলিগলি চিনিয়ে দেয়া, বাঙালিদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া, বাঙালিদের ঘরবাড়ি লুটপাট করাসহ এদেশের মা-বোনদের ধরে ধরে তাদের কাছে হস্তান্তর করা থেকে শুরু করে এমন কোনো অপকর্ম নেই যা তারা সে সময় করেনি। ১৯৭১-এ এসব ঘৃণ্য অপকর্মের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী এবং দেলোয়ার হোসাইন সাইদীসহ অনেকে। সে সময় লুটপাট করে নিজেরা টাকার পাহাড় গড়েছেন, পাক-হানাদারদের টাকার পাহাড় গড়তে সহায়তা করেছিলেন। সে সময় জীবন রক্ষার্থে বাধ্য হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয় এ দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ। বাংলাদেশের এহেন চরম পরিস্থিতিতে পার্শ্ববর্তী দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের জনগণের দুঃসময়ে এসে পাশে দাঁড়ান মানবতার কল্যাণে। এই এক কোটি মানুষকে তিনি যেমন থাকা-খাওয়ার আশ্রয় দেন, তেমনি পাড়ি দেয়া বাংলাদেশের লোকজনদের সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত করে অস্ত্র-রশদসহ নিয়মতান্ত্রিকভাবে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজ দেশেই পাঠিয়ে দেন বাঙালিদের– এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়টিও বিভিন্ন দেশের সাথে আলোচনা করে পাকাপোক্ত করেন তিনি। পরিশেষে জেনারেল মানেকশ এবং জেনারেল অরোরার নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর স্বপক্ষে মিত্রবাহিনী হিসেবে এবং পাক বাহিনীর বিপক্ষে বাংলাদেশের যুদ্ধ ময়দানে প্রেরণ করেন।

ভারতীয় সৈনিকরা মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপক্ষে মিত্রবাহিনী হিসেবে যোগ দেন। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়। উত্তাল নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের পর পাকিস্তানী জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল অরোরার কাছে পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বীর বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ দেশ স্বাধীন হয়। 'বাংলাদেশ' নামে বিশ্বের মানচিত্রে আরো একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগের ভূমিকা

মফিদা আকবর

১৯৩৮ সালে কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমত. সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের দাবি তুলে ধরা, দ্বিতীয়ত. মুসলমান ছাত্রদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং তৃতীয়ত. শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করা, মুসলমানদের এই বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য যা প্রতি মুহূর্তে ছিল অপরিহার্য অথচ সবসময় শাসকগোষ্ঠীরা যে স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে সবসময় এড়িয়ে গেছে– তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে উক্ত বিষয়গুলোকে ভিত্তি করেই পূর্বেকার ছাত্র সংগঠন নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে "নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ" গঠন করেন। বলতে গেলে ছাত্রলীগের যাত্রা শুরু হয় সে সময়ই। এরপর ক্রম-ধারাবাহিকতায় ছাত্রলীগ বিভিন্ন বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে একের পর এক।

১৯৩৮ সালে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কার্যকর ও দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের যত আন্দোলন হয় সেসবের পুরোভাগে সব সময় ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। যেমন– ১৯৪৫ সালের ২২ নভেম্বর নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বানে সারা কলকাতা শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। ইসলামিয়া কলেজ ছাত্রলীগের নেতা জহির উদ্দিন, নূরউদ্দিন আহমদ, কাজী আহমদ কামাল, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব-দানকারী মিছিল থেকে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে– "ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়, ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়"। অবশ্য সমগ্র ভারত জুড়ে তখন মহাত্মা গান্ধী এবং ইন্দিরা গান্ধীর পিতা জওহর লাল নেহরুর নেতৃত্বে তীব্র সংগ্রাম-আন্দোলন চলছিল। এসব চতুর্মুখী আন্দোলনের ক্রম-ধারাবাহিকতায় প্রায় দুইশ বছরের শাসন-শোষণের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ভারত ছাড়তে বাধ্য হয় ব্রিটিশরা। কিন্তু অপকৌশলে ব্রিটিশরা পাক-ভারতকে বিভক্ত করে রেখে যায়। ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় পাকিস্তান অংশে পূর্ব বাংলার ভাগ্য জড়িয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ নতুন করে ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে চূড়ান্ত শোষকের

হাতে নির্যাতিত হয় প্রতি মুহূর্তে। দীর্ঘ তেইশ বছর তারা বিভিন্নভাবে পূর্ব বাংলার জনগণদের অত্যাচার এবং নিষ্পেশিত করে। যে কারণে মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ব্যানারে আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখতেই হয়। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী '৭০-এ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানিরা তালবাহানা শুরু করে। ক্ষমতা হস্তান্তর করতে মুজিবের নেতৃত্বে সারাদেশে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই প্রেক্ষিতে পাকিস্তানিরা রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুজিবের নির্দেশে শুরু হয় পাল্টা আক্রমণ, যার নাম হয় মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগের হাজার হাজার নেতাকর্মী বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধীনতা এবং মুক্তির লক্ষ্যে প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। সর্বোপরি, তারাও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গ্রাম বাংলার মানুষদের যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়। বাংলার দামাল যুবকরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল– কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না–ছাত্রলীগের নেতৃত্বে তারাও সঠিক দিকনির্দেশনা পেল এবং অকুতোভয় সাহস নিয়ে নিজের জীবনকে বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। ছাত্রলীগ মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয়মাস অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আওয়ামী লীগের পক্ষে।

মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ইন্দিরা গান্ধী

মফিদা আকবর

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঘুমন্ত বাঙালির উপর যখন অতর্কিতে হামলা চালিয়ে জ্বালাও-পোড়াও আর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাতে শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানিরা– তখন বাঙালিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। ঢাকা শহরের লোকজন গ্রামের দিকে পালাতে শুরু করে। ক্রমে জেলাশহর এবং গ্রামে গ্রামেও হানা দিতে শুরু করে পাকবাহিনীরা। এ পর্যায়ে বাঙালিদের ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না। বীরদর্পে বাঙালিরা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল পাক বাহিনীদের রুখতে। কিন্তু সেই পর্যায়ে বাঙালিদের কিইবা সামর্থ্য ছিল যুদ্ধ করার মত। উন্নতমানের অস্ত্রসামগ্রী, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ, অর্থকড়ি, এসব কিছুই ছিল না সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের। পূর্ব পাকিস্তানের যা কিছু সম্পদ ছিল এর সবই ছিল পশ্চিমাদের করায়ত্তে। তখন বাঙালিদের একটিই সম্পদ ছিল আর তা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মত একজন আপসহীন মহান নেতা। যার ডাকে নিঃস্ব বাঙালিরা একমাত্র সম্বল বুকবল আর সাহস নিয়ে বীরদর্পে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধ ময়দানে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগর পাড়ি দিতে যেমন সাহস প্রয়োজন, তেমন চাই– রসদ। বাঙালিদের সাহস থাকলেও কোন রসদই ছিলো না।

শত্রু যখন নির্বিচারে গণহত্যায় লিপ্ত হয় নিরস্ত্র বাঙালির উপর। যখন বাঙালির কোন সহায় নেই, আশ্রয় নেই, তখন বিপন্ন মানবতার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন পার্শ্ববর্তী দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

বাঙালির সেই মহাদুর্দিনে, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দৃঢ়তা ও সাহসী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই তখন বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রধান ভরসা হয়ে দাঁড়ায়।

২৭ মার্চ ১৯৭১ ভারতীয় লোকসভায় ভাষণ দানকালে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, পূর্ব বাংলায় একটি নতুন ঘটনা ঘটেছিল– তা হলো, গণতান্ত্রিক নির্বাচন। সেখানকার জনগণ প্রায় একই কণ্ঠস্বরে তাদের রায় দিয়েছিল। আমরা এ ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য নয়, বিজয়ী আওয়ামী লীগ যে

মূল্যবোধের জন্য সংগ্রাম করেছিল, আমরাও সেই একই মূল্যবোধ অর্থাৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছি। আমরা আশা করেছিলাম পাকিস্তানের নির্বাচন প্রতিবেশী দেশে একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। কিন্তু তা হয়নি। পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার একটি অপূর্ব সুযোগ হারিয়ে গেছে। হৃদয় বিদারকভাবে এবং দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই সে সুযোগ হারিয়ে গেছে যা নিয়ে বলার মত যথোপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এ পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব আমরা ঘটনাবলী ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি। গণহত্যা ও অন্যান্য বিষয়ে পরিষদ সদস্যরা যেসব পরামর্শ দিয়েছেন, আমরা সে সব বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন রয়েছি। আমরা সব সময়ই নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছি।... আমি পরিষদকে আশ্বাস দিতে পারি যে আমরা পরিস্থিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখবো।

ভারতীয় লোকসভায় প্রদত্ত ইন্দিরা গান্ধীর এই বক্তৃতার মধ্যেই একটি প্রতিশ্রুতিও ছিল– নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি। অচিরেই আমরা তার বাস্তব প্রকাশ দেখলাম। গণহত্যা থেকে প্রাণ বাঁচাতে লাখ লাখ শরণার্থী পাড়ি জমাল ভারত সীমান্তে। পরম বন্ধুর মতই ভারত সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিল বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য, আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হল সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে। একাত্তর সালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। প্রায় ১ কোটি শরণার্থীর ভরণপোষণের দায় নেবার সাধ্যও ছিল না সে দেশের। তবু এই মানবিক দায়িত্ব পালন থেকে পিছিয়ে যায়নি ভারত। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট আগরতলার শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনে এসে ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা আক্রান্ত, বিপন্ন। বিশ্বের কোন বৃহৎ রাষ্ট্রই আজ পর্যন্ত এত বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর দায় নেয়নি। ভারতের সে ক্ষমতাও নেই। তবু কথা দিচ্ছি, ভারত তার মানবিক দায়িত্ব ও দায় থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। ভয়ে ভীত হয়ে ভারত সেই দায়িত্ব পালনে বিরত হবে না।

একাত্তরের ৩১ মার্চ ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় লোকসভায় বক্তৃতাকালে বাংলাদেশের নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানান। এমনকি বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন অব্যাহত থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের হুমকি দিলেও তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি তিনি। পরিণামে নয়াদিল্লীতে ইউএস এইডের অফিস বন্ধ হয়ে যায়।

সে সময় ভারত কেবল বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকেই সে দেশে আশ্রয় দেয়নি, সেইসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদেরও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। কিন্তু একাত্তরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্ব জনমত, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম দেশসমূহ ইয়াহিয়া খানের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখে। ঐ মাসে

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের পক্ষে ভোট দিলে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের উদ্দেশ্যে বিশ্ব পরিভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। একাত্তরের নভেম্বরে তিনি বিশ্ব-পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন এবং একে একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশসমূহে গিয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং গণতন্ত্রের জন্য বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরেন। প্রায় এক কোটি শরণার্থীর চাপের ফলে কীভাবে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয় ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে তিনি তাও ব্যাখ্যা করেন। যার ফলশ্রুতিতে অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন তিনি। বিশ্ব জনমতসাপেক্ষে তিনি বাংলাদেশকে সার্বিক সহায়তা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দমন অভিযান শুরু করেন।

এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সামরিক বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ কমান্ড কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। যারা মুক্তিযুদ্ধে 'মিত্রবাহিনী' নামে পরিচিত। এরই ফলশ্রুতিতে অল্প সময়ের মধ্যে পরাজয় ঘটে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে ভারত তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহান বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ দেশ স্বাধীন হয়। 'বাংলাদেশ' নামের একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে বিশ্বের বুকে।

সপরিবারে নিহত বঙ্গবন্ধু

মফিদা আকবর

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। রাত দশটা। ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্ত। বেঙ্গল ল্যান্সারের টি ৫৪ ট্যাঙ্কগুলো নিজস্ব ইউনিট লাইন থেকে বেরিয়ে মিলিত হলো টু ফিল্ড রেজিমেন্টের সঙ্গে। ঘন্টা দুই পর এসে উপস্থিত হলেন মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর বজলুল হুদা, মেজর শাহরিয়ার, মেজর পাশা। ভীষণরকম ব্যস্ত মেজর ফারুক ও কর্ণেল রশিদ। ব্লু প্রিন্ট মোতাবেক শলা-পরামর্শ করে নিলেন সবাই। অতঃপর যে যার দায়িত্বে চলে গেলেন।

রাত সাড়ে বারোটা। এয়ারপোর্টের পাশে অবস্থিত হেড কোয়ার্টার স্কোয়াড্রন অফিসে সমবেত হলেন ষড়যন্ত্রকারীরা। কমান্ডার মেজর ফারুক টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিলেন ঢাকা শহরের ম্যাপ। মেজর ফারুকের কাঁধে স্টেনগান। ম্যাপ দেখিয়ে মেজর ফারুক সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন পুরো অপারেশনের বিষয়টি। প্রথম টার্গেট ৩২ নম্বর রোডে শেখ মুজিবের বাড়ি। আক্রমণের দায়িত্বে মেজর মহিউদ্দিন। তবে বাইরে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে থাকবেন মেজর নূর ও হুদা। শেখ মনির বাসায় আক্রমণের দায়িত্ব পালন করবে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন। শেখ সেরনিয়াবাতের বাসায় আক্রমণ করবে মেজর ডালিম। মেজর রশিদ আফটার এ্যাকশন সমস্ত রকম যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন সর্বত্র।

ভোর পাঁচটা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়ির আশেপাশে আক্রমণকারীদের সুদৃঢ় অবস্থান। সোবহানবাগ, কলাবাগান, ধানমণ্ডি লেক এলাকায় আক্রমণকারীদের সতর্ক প্রহরা। সবার কাছেই ভারী অস্ত্রশস্ত্র। ট্যাঙ্ক নিয়ে সরাসরি ৩২ নম্বর রোডে হাজির মেজর ফারুক। মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, মেজর পাশা ও মেজর নূরের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ঘিরে ফেলেছে শেখ মুজিবের বাড়ি। অন্যরা নির্দেশ মোতাবেক স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করছেন। মেজর হুদা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঢুকতে চাইলেন। কিন্তু বাধ সাধলেন প্রহরীরা। প্রহরীদের সঙ্গে মেজর হুদার কথা কাটাকাটি হলো কয়েক মিনিট। এরই মধ্যে হট্টগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামালের। শেখ কামাল বুঝতে পারলেন তাদের উপর আক্রমণ নেমে এসেছে।

আত্মরক্ষার্থে গুলি ছুঁড়লেন তিনি। দমলো না আক্রমণকারীরা। দ্রিম দ্রিম করে তারাও গুলি ছুঁড়লো। মৃত্যু ঘটলো শেখ কামালের।

সব প্রাচীর ব্যূহ ভেদ করে আক্রমণকারীরা ভেতরে ঢুকলেন। ততক্ষণে ঘুম ভেঙ্গে গেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। পুরো ব্যাপারটি আঁচ করতে পারলেন তিনি। আক্রমণকারীদের সঙ্গে দোতলার সিঁড়ির মুখেই শেখ মুজিবের সাক্ষাৎ। উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, কি চাস তোরা? আক্রমণকারীরা বললো, আপনাকে নিতে এসেছি। অনেকটা গর্জে উঠে শেখ মুজিব বললেন, কি, তোদের এত সাহস, পাকিস্তানী আর্মি আমাকে মারতে পারেনি, আমি জাতির পিতা। কেউ আমাকে মারতে পারবে না। আক্রমণকারীরা আবার বললো, ঠিক আছে তবে আপনাকে যেতেই হবে। প্রত্যুত্তরে মুজিব বললেন, যাবো। আমার পাইপ ও তামাকটা নিতে দে। পাইপ হাতে শেখ মুজিব সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেন। মেজর হুদা শেখ মুজিবের বামে। এ সময় মেজর নূর চিৎকার করে বললেন, হুদা হোয়াই আর ইউ ওয়েস্টিং টাইম, গেট এ সাইড। সঙ্গে সঙ্গে মেজর নূরের স্টেনগান গর্জে উঠলো। শেখ মুজিব পড়ে গেলেন সিঁড়িতে। ২৯টি গুলি বিদীর্ণ করলো তার বুক। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল রক্তের ধারা। এরপর এক এক করে হত্যা করা হলো ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে উপস্থিত সবাইকে। শিশু রাসেলকেও হত্যা করা হলো। বেগম মুজিব, শেখ জামাল, সুলতানা কামাল, রোজি জামাল, শেখ নাসেরসহ অন্য সবাইকে হত্যা করলো খুনীরা। এদিকে নির্দেশ মোতাবেক শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রব সেরনিয়াবতসহ অন্যদেরও হত্যা করলো বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যরা।

১৫ আগস্টের কালো রাত্রিতে শেখ মুজিবসহ অন্যদেরকে এভাবেই হত্যা করা হয়েছিল। তবে এ নির্মম হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে নানারকম মত-অভিমত রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড নিয়ে এ পর্যন্ত গবেষণাও হয়েছে প্রচুর। বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত হত্যাকারী কে এ বিষয়টি আজও রহস্যাবৃত। তবে অনেকের গবেষণাকর্মে এক একজনের আলাদা আলাদাভাবে নাম এসেছে। কারো কারো মতে, মেজর হুদাই হলেন শেখ মুজিবের প্রকৃত খুনী। আবার কারো কারো মতে, মেজর নূর হলেন প্রকৃত খুনী, রিসালদার মোসলেম উদ্দিনও আছে প্রকৃত খুনীর তালিকায়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মেজর ফারুক এবং কর্ণেল রশিদ সাক্ষাৎকার দিলেও তারা সবসময়ই মূল বিষয়গুলো এড়িয়ে গেছেন। তারা কখনোই বলেননি যে, শেখ মুজিবের বুকে কে গুলি চালিয়েছেন। মেজর বজলুল হুদাও নানা পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কিন্তু তিনিও মূল রহস্যের জট খুলেননি। তবে মেজর নূরই যে বঙ্গবন্ধুর বুকে গুলি চালিয়েছেন

এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে। লেঃ কর্ণেল এম, এ মান্নান ছিলেন এক সময়ে মেজর মহিউদ্দিনের কমান্ডার। ১৫ আগস্ট মেজর মহিউদ্দিন হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে লেঃ কর্ণেল (অব.) এম, এ হামিদের লেখা 'তিনিট সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা' বইটিতে মেজর মহিউদ্দিনের বর্ণনায়– 'মেজর ফারুক আমার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি বাসার দোতলায় গিয়ে তাকে পেলাম। তখন ফায়ারিং থেমে গেছে। তিনি (শেখ মুজিব) উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তোমরা কি আমাকে মারতে চাও? আমাকে পাকিস্তানীরা মারতে পারেনি। বাঙালিরা আমাকে মারতে পারে না। আমি বিনীতভাবে বললাম, না স্যার আপনাকে শুধু নিতে এসেছি। আপনি চলুন। তিনি (শেখ মুজিব) খুবই রেগে গেলেন। তিনি কামরায় গিয়ে কয়েক জায়গায় টেলিফোন করলেন। আমি আবার তাকে বললাম, স্যার এবার প্লিজ চলুন। তিনি একটু নরম হলেন। আমরা তাকে নিয়ে তার কক্ষের বাইরে যাই। তিনি পাইপ হাতে নিয়ে বারান্দা হয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ান। আমরা তার সঙ্গে কিন্তু একটু পেছনে। ঠিক ঐ সময় নিচে দাঁড়িয়েছিলো মেজর নূর ও আরও কয়েকজন সৈনিক। সম্ভবত মোসলেম উদ্দিনও। হঠাৎ মেজর নূর আবোল-তাবোল বলে চিৎকার দিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে নূর তার স্টেনগান উঁচু করে শেখ মুজিবের বুকে একঝাঁক গুলিবর্ষণ করলে শেখ মুজিবের দেহ লুটিয়ে পড়ে সিঁড়ির ওপর।

এ বইটিতে উদ্ধৃত হয়েছে ডাঃ ফয়সালের বক্তব্য। ডাঃ ফয়সাল ছিলেন শেখ জামালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ডাঃ ফয়সাল লেঃ কর্ণেল এম, এ হামিদের কাছে ঐদিনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে : "ঐ রাতে আমি, শেখ জামাল ও আরো দু'জন বন্ধু পাশের বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে গভীর রাত পর্যন্ত গল্প-গুজব করছিলাম আর ক্যারাম খেলছিলাম। এমন সময় ভোর রাত আনুমানিক চারটার সময় শেখ সাহেবের বাসার গেটে হট্টগোল শুরু হয়। ঐ সময় আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও জামাল পেছন দিকের দেয়াল টপকে তার বাসার ভেতর ছুটে যায়। আমরা বললাম, জামাল যাসনে সিরিয়াস গণ্ডগোল হচ্ছে। যেতে যেতে সে বললো বাসায় বউ রেখে এসেছি। ও একা ভয় পাবে। সে বাসায় পৌঁছতে না পৌঁছতে তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। প্রথমে দোতলার ছাদের ওপর থেকে গেটের কাছে হামলাকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করার আওয়াজ এলো। সঙ্গে সঙ্গে গেটের কাছে দু-তিনজন সৈন্য মাটিতে পড়ে যেতে দেখলাম। ব্যস, এর পরপরই চুতর্দিকে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। হামলাকারীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। বাসার উপর বৃষ্টির ধারার মত গুলি আসতে লাগলো। যখন গোলাগুলি চলছিল তখনই দেখলাম বাসার পেছন

দিকে দোতলায় উঠার সিঁড়ির দরজার কাছে তাদের বেশ ক'জন সৈনিক জড়ো হয়ে উপরে উঠার পাঁয়তারা করছে। সিঁড়ি ঘরের দরজা খোলা ছিল। পাশের বাসার দোতলার বারান্দা থেকে মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে আমি সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম হামলাকারীদের একজন সিঁড়ি দিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকে পড়েছে এবং শেখ সাহেবের সঙ্গে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা করছে। শেখ সাহেব চড়া সুরে উত্তেজিত কণ্ঠে তাদের সঙ্গে ধমক দিয়ে কথা বলছিলেন। উত্তপ্ত কথা-বার্তা থেকে আমার ধারণা হয়, হয়ত হামলাকারীরা শেখ সাহেবকে কোথাও বন্দী করে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু অকস্মাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেলো। একসময় একটি আওয়াজ স্পষ্ট পেলাম 'গেট এ সাইড'। সঙ্গে সঙ্গে ট্যা-র-র-র। বিকট শব্দের ব্রাস ফায়ার। "আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শেখ সাহেব সিঁড়ির উপর লুটিয়ে পড়লেন।"

শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর ফারুক-রশিদ গং দ্রুত সবার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলেন। প্রথমেই আর্টিলারির ওয়ারলেস সেটে সংবাদটা জানানো হলো মেজর আব্দুর রশিদকে। এ খবর নিয়ে পরিকল্পনা মোতাবেক মেজর রশিদ গেলেন ৪৬তম বিগ্রেড কমান্ডার কর্নেল সাফায়াত জামিলের কাছে। সাফায়াত জামিলকে ঘুম থেকে তুলে সব ঘটনা বললেন মেজর রশিদ। ঘটনা শুনে বিস্মিত হলেন কর্ণেল সাফায়াত জামিল। এদিকে রেডিও বাংলাদেশ থেকে সকাল ছয়টার অধিবেশন শুরু হতেই মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। "আমি মেজর ডালিম বলছি, স্বৈরাচারী সরকার শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।" মুহূর্তে গোটা জাতি পেলো নৃশংস নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর। এদিকে মেজর রশিদ ট্যাংক নিয়ে গেলেন আগামসি লেনে। খন্দকার মোশতাক আহমেদকে নিয়ে চললেন রেডিও স্টেশনের দিকে। ওদিকে মেজর ফারুক ট্যাংক নিয়ে শেরে বাংলা রোড ধরে পৌঁছলেন শেখ মুজিবের বাড়িতে। শেখ মুজিবের বাড়িতে পৌঁছতেই মেজর নূর বেরিয়ে এসে বললেন, 'টার্গেট ফিনিশ শেখ ইজ ডেড'। অতঃপর মেজর ফারুক ট্যাংক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঢাকা শহরে। বঙ্গভবন হয়ে ফিরে এলেন ক্যান্টনমেন্টে। শেখ মুজিব নিহত হওয়ার সময় সেনা প্রধান ছিলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। অনেকেই মনে করেন সেদিন যদি জেনারেল শফিউল্লাহ বঙ্গবন্ধুর সাহায্যের জন্য দ্রুত হাত বাড়াতেন তা হলে হয়তো বা শেখ মুজিবকে ফারুক-রশিদের গংরা খুন করতে পারতো না। যারা এরকম বক্তব্যের পক্ষে তাদের যুক্তি হলো– যেহেতু শেখ মুজিব শফিউল্লাহকে টেলিফোনে সব ঘটনা জানান। সেহেতু জেনারেল শফিউল্লাহর উচিত ছিল জীবন-মরণ বাজি রেখে

প্রেসিডেন্টকে বাঁচানো। উল্লেখ্য, শেখ মুজিবের বাড়িতে হামলার পরপরই শেখ মুজিব টেলিফোনে জেনারেল শফিউল্লাহকে বলেছিলেন, শফিউল্লাহ আমার বাসা এ্যাটাক করেছে, কামালকে হয়তো মেরেই ফেলেছে। তুমি তাড়াতাড়ি ফোর্স পাঠাও। জবাবে শফিউল্লাহ বলেছিলেন, স্যার ক্যান ইউ গেট আউট, আই এম ডুয়িং সামথিং।

১৫ আগস্ট যারা নিহত হন তাদের মধ্যে শেখ মুজিব ছাড়া অন্য সবাইকে দাফন করা হয় বনানী গোরস্থানে। শেখ মুজিবকে দাফন করা হয় টুঙ্গিপাড়ায়। হেলিকপ্টারযোগে তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে। সৈনিকদের ইচ্ছে ছিলো লাশ দ্রুত দাফন করার। কিন্তু সেদিন বাধ সেধেছিলেন মৌলভী শেখ আব্দুল হালিম। লাশের কফিন নামানোর পর শেখ আব্দুল হালিম সৈনিকদের সরাসরি বলেছিলেন এটা শেখ মুজিবের লাশ কিনা আদৌ-তা নিজ চোখে দেখতে হবে তারপর লাশ দাফন করতে হবে। সৈনিকরা কাফন খোলার পর মৌলভী শেখ আব্দুল হালিম নিশ্চিত হন এটা শেখ মুজিবের লাশ। অতঃপর ৫৭০ সাবান কিনে আনা হয়। রেড ক্রিসেন্টের গুদাম থেকে আনা হয় থান কাপড়। এরপর গোসল করানো হয় শেখ মুজিবকে। তারপর জানাজা শেষ করে মুজিবকে চির নিদ্রায় শুইয়ে দেন স্বজনেরা।